পথের দিশারী
ডাঃ হেডগেওয়ার

পথের দিশারী
ডাঃ হেডগেওয়ার

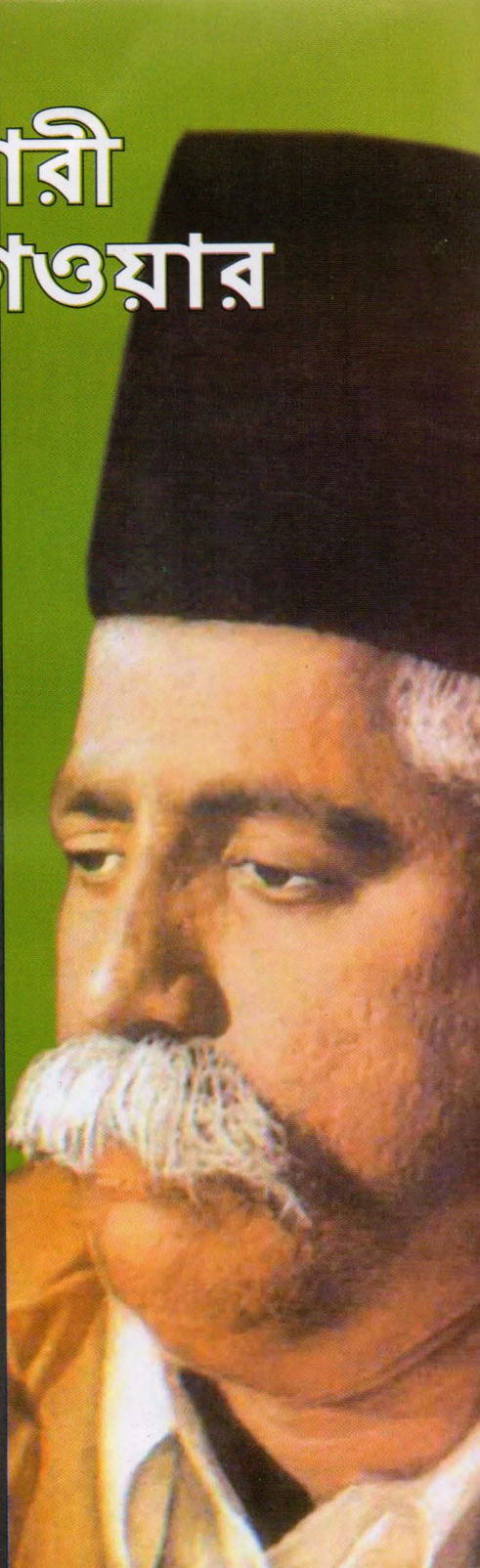

পথের দিশারী

ডাঃ হেডগেওয়ার

অধ্যাপক শ্রীভাইয়াজী সহস্রবুদ্ধে

প্রকাশক ঃ
স্বস্তিক প্রকাশন
২৭/১বি বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

অনুবাদক ঃ
শ্রীভুবনেশ্বর দাস

অক্ষর বিন্যাস ঃ
লেজার রাইটার
১০, মদন মিত্র লেন,
কলিকাতা-৭০০০৩৭

মুদ্রক ঃ
গীতিকা মাইতি
প্রিন্টিং কর্ণার
২০৯বি, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রাপ্তিস্থান ঃ
সঙ্ঘ বস্তু ভাণ্ডার
৪২, কালিকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭০

মূল্যঃ
কুড়ি টাকা

১লা এপ্রিল ১৮৮৯ সালের কথা। দিনটি ছিল চৈত্রের পবিত্র প্রতিপদ। মহারাষ্ট্রের সর্বত্র নববর্ষ উৎসবের আয়োজন।

মুহূর্তটি ছিল সকাল বেলা। ঝাড়ঝাঁটা সহ প্রতিটি বাড়ী শুধু পরিষ্কারই ছিলনা, মহারাষ্ট্রের পদ্ধতি অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের আলপনা সহ বাড়ীগুলোকে অতীব সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল। কেউ কেউ বাড়ীর দরজায় আমপাতার তোরণ তৈরী করতে ব্যস্ত ছিল। বাচ্চারা তাদের সাহায্য করে চলেছিল। কেউ আনছিল নিমগাছের ডাল, আবার কেউ আমের পাতাও আনছিল। স্বাগত তোরণ তৈরী করতেও অনেককে দেখা যাচ্ছিল। কেউ আনছিল ফুল আবার কেউ তৈরী করছিল ফুলের মালা।

মহারাষ্ট্রে বর্ষপ্রতিপদাকে "গুড়ী পাড়ওয়া" বলা হয়ে থাকে। গুড়ীর মানে হচ্ছে ধ্বজ। সেইদিন প্রতি আঙ্গিনায় ধ্বজোত্তোলন হয়ে থাকে। সাথে ধ্বজের পূজোও হয়ে থাকে।

সেইজন্য ছেলেরা সেই সমস্ত জিনিস সংগ্রহ করছিল। তাদের মধ্যে সেইজন্য প্রতিযোগিতার ভাবও ছিল বিদ্যমান। আমাদের বাড়ীর ধ্বজ হবে সবচেয়ে সুন্দর ও সবচেয়ে উঁচু। ধ্বজোত্তোলনের সময় ছেলেরা হাততালি বাজাত ও আনন্দে নাচতে থাকত, এইদিনে সকলে নূতন কাপড় পরে, ঘরে ঘরে মিষ্টি তৈরী হয়। চারিদিকে যেন আনন্দ ও উৎসবের পরিবেশ।

নাগপুরে পণ্ডিত বলিরামপন্ত হেডগেওয়ারের বাড়ীতে এই আনন্দ যেন অধিক মাত্রায় দেখা দিল। পৌরাণিক তথা ঐতিহাসিক দিক থেকে দিনটি ছিল অত্যন্ত স্মরণীয়। দিনটি ছিল শুভদিন। ছিল মহত্ত্বপূর্ণ উৎসব। ঐ দিন সেই বাড়ীতে এক বালকের জন্ম হয়। তাই এই শুভদিনটিকে সকলে স্মরণ করে থাকে।

কোন একজন বললেন—কি সুন্দর শুভক্ষণে ছেলেটির জন্ম হল। আগামী দিনেতে ছেলেটি নিশ্চয় নিজের শক্তির পরিচয় দেখাবে।

অপর একজন বললেন—"বর্ষপ্রতিপদা" অর্থই তো বিজয় দিবস। বহু পূর্বে এই দিনে সম্রাট শালিবাহণ আক্রমণকারী শকদেরকে মেরে তাড়িয়েছিলেন। তার স্মরণেই তো আমাদের এই ধ্বজোত্তোলন। কথিত আছে, না ছিল তাঁর কাছে কোন টাকা পয়সা, না ছিল সৈন্যসামন্ত, না ছিল কোন ক্ষমতা। কিন্তু দেশের দুঃখে ছিলেন তিনি দুঃখী এবং ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী।

এহেন অনেক শুভ কামনার সাথে সেই নবাগতকে সকলে স্বাগত জানাল। ১২ দিনে ছেলেটির নামকরণ হল।

ছেলেটির নাম রাখা হল কেশব।

— ❖ —

বংশ-পরিচয়

অন্ধ্রপ্রদেশে নিজামাবাদ জেলার বোধন মহকুমায় কুন্দকুর্তী নামে এক গ্রাম আছে। গোদাবরী, হরিদ্রা ও বনজরা এই তিন নদীর সঙ্গমস্থলে এই গ্রাম অবস্থিত। এখানেই প্রাচীনকাল থেকে হেডগেওয়ার পরিবার বসবাস করত। বিদ্যা অধ্যয়ন এবং পাণ্ডিত্যের দিক থেকে এই পরিবারের বিশেষ সম্মান ছিল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে এই বংশের একটি শাখা নাগপুরে এসে বসবাস আরম্ভ করে। এই বংশেই কেশবের জন্ম হয়।

কেশবের বাবার নাম বলিরাম ও মার নাম ছিল রেবতী। কেশবেরা ছিল তিন ভাই ও তিন বোন। বড় ভাইয়ের নাম ছিল মহাদেব। মেজটির নাম ছিল সীতারাম এবং কেশব ছিল সর্বকনিষ্ঠ।

পণ্ডিত বলিরাম ছিলেন একজন বিদ্বান্। তিনি অগ্নিহোত্রের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বেদ পাঠ এবং পুরোহিতগিরি করে সংসার প্রতিপালন করতেন।

তাঁর বড় ছেলে মহাদেব শাস্ত্রী পড়াশুনায় খুবই ভাল ছিল। অন্যদিকে শারীরিক দিক থেকেও তার খুব সুনাম ছিল। সে প্রতিদিন ব্যায়াম করত এবং হাজার হাজার ডন ও বৈঠকের অভ্যাস করত। কুস্তিতে সে ছিল খুবই দক্ষ এবং মলখম্বের প্রতি তার বিশেষ টান ছিল। সে নিজের পাড়ার ছেলেদের আগ্রহপূর্বক ব্যায়ামশালায় নিয়ে যেত এবং তাদের সকলকে কুস্তি মলখম্ব ইত্যাদি শেখাত।

তার স্বভাব ছিল খুব তেজী। কথিত আছে একদিন সে বাড়ীর দোতালার বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে ছিল। নীচে রাস্তায় কয়েকটা গুণ্ডাকে দেখা যায়। তাদের মধ্যে একজন পথের মেয়েদেরকে টিটকারী মারা শুরু করে। তা দেখা মাত্রই মহাদেব বিচলিত হয়ে পড়ে। সেখান থেকেই চীৎকার করে তাদেরকে সাবধান করে ও সাথে সাথে দোতলার ছাদ থেকে নীচে লাফ দেয়। সে একাকী ওদের সাথে লড়াই শুরু করে এবং এক একজনকে ধরে এবং মারা শুরু করে। মার খেয়ে দলের নেতা যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে তখন অন্যান্য সকলে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। তখন থেকে সেই পাড়ায় মেয়েদের নিয়ে এ ধরনের অভদ্র আচরণ করতে আর কাউকে দেখা যায় নি। শহরের এই অংশে মহাদেব শাস্ত্রীর খুব নাম ছিল।

মহাদেব শাস্ত্রী কেশবকে খুবই স্নেহ করত। সে প্রতিদিন কেশবকে ব্যায়ামশালায় নিয়ে যেত এবং তাকে ডন, বৈঠক, কুস্তি, মলখম্ব ইত্যাদি শিক্ষা দিত।

মা-বাবার ছত্রছায়ায় বেশী দিন থাকার সুযোগ কেশবের ভাগ্যে ঘটেনি। ১৯০২ সালে নাগপুরে সর্বত্র প্লেগের প্রকোপ দেখা যায়। পণ্ডিত বলরামের অভ্যাস ছিল সকলের বাড়ী বাড়ী যাওয়া ও সকলকে সাহায্য করা। অবশেষে একদিন নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সাথে স্ত্রী রেবতীও অসুস্থ হয়ে পড়েন। দুজনেই প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে একই দিনে মারা যান। সেই সময় কেশবের বয়স মাত্র ১২।

— ❖ —

বুদ্ধিমান বালক

কেশব একজন বুদ্ধিমান বালক। স্মরণ শক্তি ছিল অসাধারণ। রামরক্ষা স্তোত্র এবং স্বামী রামদাস রচিত মনোবোধের বিভিন্ন শ্লোক অল্প সময়ে সে মুখস্থ করে ফেলেছিল। যখন সে গীতার বিভিন্ন অধ্যায় এবং সংস্কৃত স্তোত্র শুনান শুরু করত তখন সব বড় বড় লোকেরা আশ্চর্য হয়ে পড়তো। নিজের দাদার সাথে প্রতিদিন মহাভারত, রামায়ণ ইত্যাদি শুনবার জন্য যেতো এবং মন দিয়ে সেগুলো শুনতো। প্রত্যেকটি কথার অর্থ সাথে সাথে বুঝবার চেষ্টা করতো। ছত্রপতি শিবাজীর গল্প শুনতে সে খুবই ভালবাসতো। সে সমস্ত শুনতে শুনতে যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলতো।

একদিন বাহিরের গ্রাম থেকে এক আত্মীয় কেশবের বাড়ীতে বেড়াতে আসে। গল্প শুনানোর দিক থেকে সে ছিল অত্যন্ত দক্ষ। সে তখন শিবাজীর বাল্যকালের এক ঘটনার কথা বলে। কেশব তন্ময় হয়ে তা শোনে। গল্প শেষ হওয়া মাত্র অন্য সব ছেলেরা সেখান থেকে এদিক ওদিক চলে যায়। কেশব কিন্তু সেখানেই বসে থাকে। মনে মনে সে তখন শিবাজীর কালে পৌঁছে গিয়েছে। সে যেন ঘটনাগুলো নিজের চোখে ঘটতে দেখছে। শিবাজীকে নিয়ে শিবাজীর বাবা শাহজী বিজাপুরস্থিত আদিলশাহের দরবারে উপস্থিত। শাহজী বললেন—"বাবা আমার, শাহানশাকে প্রণাম করো।" বালক শিবাজী বিরক্ত হয়ে বললো—"না তা সম্ভব নয়। ইনি তো আমাদের সমাজের কেউ নন, এমন কি দেশ ও ধর্মেরও ইনি কেউ নন। ওঁকে আমার পক্ষে প্রণাম করা একেবারেই অসম্ভব।"

এই সময় কেশবকে যেন কে একজন ডাকে কিন্তু সে ডাক তার কানে প্রবেশ করে না। কাছে এসে কাঁধে হাত দিয়ে কেশবকে এক ঝাঁকুনি দিলে সে তখন ঐতিহাসিক কাল থেকে ফিরে আসে বর্তমান কালে। দেশের সম্বন্ধে ভাবনা সেই ছোট্ট বয়স থেকেই তার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

— ❖ —

সেই মিষ্টি খাওয়া পাপ

মিষ্টির প্রতি বাচ্চাদের আকর্ষণ স্বাভাবিক। অনেক বাচ্চাই মিষ্টির জন্য গোঁ-ধরে ও কান্নাকাটিও করে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা যে, সেই ছোট্ট কেশব হাতে মিষ্টি পাওয়া সত্ত্বেও তা নালাতে ফেলে দেয়। ঘটনাটি এইরকম ঃ—

সেই সময় ভারতবর্ষে রাজত্ব করতো ইংরেজরা। তাদের রাণী করতো রাজ্য শাসন। তার নাম ভিক্টোরিয়া। তার রাজত্বের ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিরাট উৎসবের আয়োজন করা হয়। হিন্দুস্থানেও ইংরেজরা তা ধূমধামের সাথে পালন করে। বড় বড় সভাও হতে দেখা যায়। স্থানে স্থানে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন বক্তৃতার মাধ্যমে রাণীর গুণকীর্তন করা হয়। পথে পথে কামান দাঁড় করান হয়। ধ্বজ-পতাকা-তোরণ-আদি তৈরী করে পথসমূহকে সাজান হয়। রাণীর ফটো সহ বিরাট

বিরাট শোভাযাত্রাও চোখে পড়ে। এই উপলক্ষে বিভিন্ন পাঠশালায় ছেলেদের মিষ্টি বিতরণ করা হয়। কেশবের পাঠশালাতেও মিষ্টি বিতরণের জন্য মিষ্টি আসে। কেশবের হাতে মিষ্টি এলে সে মনে মনে খুবই ব্যথিত হয়, যেন মনে হয় তাকে বিছে কামড়ে দিয়েছে। ছোট কেশবের মনে যে ধরনের ভাবনা দেখা দিয়েছিল তা হচ্ছে এই রকমের ঃ

"ইংরেজরা না আমাদের দেশের লোক, না আমাদের ধর্মের লোক। না জানি কতদূর থেকে তারা এখানে এসেছে এবং আমাদের শাসন করে চলেছে। তারা আমাদের গোলামে পরিণত করেছে। তারা আমাদের শত্রু। তাদের রাণীর ষাট বছর পূর্তির উৎসব আমরা কেন পালন করব? কেন আমরা মিষ্টি খেলাম? ছিঃ ছিঃ, এই মিষ্টি খাবার অর্থই হচ্ছে ওদের রাজত্বকে স্বীকার করে নেওয়া। এহেন গোলামীকে বরদাস্ত করা যায় না। এই মিষ্টি খাওয়া তো পাপ। এই মিষ্টি খাবার অর্থ হচ্ছে নিজ দেশের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করা। না, না, এই মিষ্টি আমি কিছুতেই খাবো না।"

বিচারের গভীরতায় প্রবেশ করা মাত্রই কেশব ঝট্ করে সেই মিষ্টি নিকটস্থ নালায় ছুঁড়ে ফেললো। তার সহপাঠীরা এহেন কাণ্ড দেখে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। নিজের বুদ্ধি অনুসারে কেশব নিজের বন্ধুদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু কেশবের কথা ওদের মগজে ঢুকলোই না।

ক্রোধী কেশবকে বাড়ীতে দেখা মাত্র কেশবের বড়দা তাকে জিজ্ঞাসা করলো, "কি ব্যাপার? রাগ করেছ নাকি? শুনতে পেলাম পাঠশালাতে নাকি তোমাদের মিষ্টি দেওয়া হয়েছে। তাকি তুমি পাওনি?"

কেশব বললো—"কেন পাবো না? কিন্তু তা আমি নালায় ফেলে দিয়েছি।"

পাশে দাঁড়ানো এক আত্মীয় এই শুনে বলে উঠলো—"বেশ করেছ ভাই, বেশ করেছ। এটা আবার কোন কথা হল? মিষ্টি আবার কখনো নালায় ফেলে নাকি?"

ঝট্ করে কেশব বলে উঠলো—"শুনছেন, ওগুলো কিন্তু মিষ্টি ছিল না, ওগুলো ছিল বিষ। যারা আমাদেরকে গোলামে পরিণত করেছে তাদের রাণীর এহেন উৎসবে আমরা কেন অংশ নেব? এ ভাবে মিষ্টি বিলিয়ে ইংরেজরা আমাদেরকে স্থায়ী গোলাম করে রাখতে চায়।"

কেশবের আবেগপূর্ণ কথা শুনে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। একজন আত্মীয় আবার বলে উঠলো—"ভাই, এতো যেমন তেমন ছেলে নয়। এতো একটু অন্যরকম মনে হচ্ছে।"

— ❖ —

দুর্গ জয়ের বাসনা

শিবাজী মহারাজার গল্প শুনতে শুনতে কেশব নিজেকে শিবাজীর একজন সৈন্য হিসাবে মনে করে নিত। কখনো কখনো ঘোড়সওয়ার হয়ে ঘোড়া নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে, আবার কখনো দুর্গ আক্রমণে ব্যস্ত আছে। অকস্মাৎ চোরা পথে দুর্গের কিলাতে পৌঁছে

যাচ্ছে। এবং দুর্গ জয় করে নিচ্ছে। প্রত্যক্ষ জীবনে এধরনের চেষ্টা করা উচিত বলে সে মনে করতে থাকে।

নাগপুর শহরের বুকে ছোট্ট একটি দুর্গ আছে যার নাম সীতাবড়ী। সেই সময় সেই দুর্গের চূড়ায় ইংরেজদের পতাকা উড্ডীন থাকতো। তা দেখে কেশবের মনে খুবই দুঃখ হতো। বন্ধুদেরকে বলতো, "ইংরেজদের এই পতাকাটাকে ওখান থেকে উঠিয়ে ফেলা দরকার। যে কোন প্রকারে সেই দুর্গটিকে জয় করে ওখানে গৈরিক পতাকা উত্তোলন করা একান্ত দরকার।"

একজন বন্ধু বললো—"কোন প্রকারে আমরা যদি ভিতরে ঢুকতে পারতাম তবে ইংরেজ সৈন্যদের মেরে বা তাড়িয়ে তা দখলে আনা সম্ভব হত।"

অপর বন্ধু বলে উঠলো—"কিন্তু কি করে ওখানে যাওয়া যাবে?"

তৃতীয় জনের মতে—"কেন, সুড়ঙ্গ করে তার মধ্য দিয়ে কি ওখানে যাওয়া যাবে না? অতএব সুড়ঙ্গ তৈরী করার জন্য লেগে পড়া যাক্।"

"চল, তাহলে সে কাজ আমরা এখনই শুরু করে দি। শুভকাজে দেরি করা উচিত নয়।"

যেখানে বালকেরা খেলা করত তারই পাশে ছিল বঝে গুরুজীর বাসা। বাসার আঙ্গিনাখানা ছিল বিরাট বড়। চারিপাশে ছিল দেওয়াল। বঝে গুরুজীর বাড়ীর লোকেরা কিছুদিনের জন্য বাইরে গিয়েছিল। যখন গুরুজী স্কুলে চলে যেতেন তখন বাড়ী থাকত জনমানব শূন্য।

সেই স্থানটিকে যোগ্য বলে মনে করা হল। সকলে নিজ নিজ বাড়ী থেকে সুড়ঙ্গ তৈরী করার জিনিষ নিয়ে এল। কেউ হয়তো নিয়ে এল কোদাল আবার কেউ আনলো খন্তে। কেউ আনলো শাবল আবার কেউ আনলো ডালা।

খুদে দেশভক্তদের এই কাজ গোপনে গোপনে চলতে থাকলো। গুরুজীর ঘরে এক বিরাট গর্ত তৈরী হল। বৈকালে গুরুজী বাড়ীতে এসে বাচ্চাদের এই কাজ দেখে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন। দু-একজনকে কাছে ডেকে জানতে চাইলেন, "কি ব্যাপার? কি জন্য এটা তৈরী করছ?" তখন সকলে সরলতার সঙ্গে ওদের পরিকল্পনার কথা গুরুজীকে জানায়। বাচ্চাদের এ ধরনের পরিকল্পনার কথা শুনে তাঁর খুব হাসি পেল, কিন্তু তাদের বাসনার কথা শুনে তিনি মনে মনে আনন্দও পেলেন। সকলকে একত্রে ডেকে তিনি সব কিছু বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কেশব ছিল ওদের পুরোধা। উনি কেশবকে আশীর্বাদ করে বললেন, "আগামী দিনে তুমি দেশসেবা ভালভাবেই করবে।"

— ❖ —

ইংরেজ রাজত্বের নমুনা

বিভেদ সৃষ্টি করাই ছিল ইংরেজদের নীতি। বিভিন্ন লোকেদের মধ্যে ঝগড়ার বীজ বপন করা এবং তা থেকে নিজেদেরকে লাভান্বিত করাই ছিল তাদের রীতি। এই অসৎ

উদ্দেশ্য মনে রেখেই ১৯০৫ সালে ইংরেজরা বঙ্গপ্রদেশকে ভাগ করার পরিকল্পনা নেয়। বাংলার নেতৃবৃন্দ এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার জন্য জনসাধারণকে সচেতন করেন। সকলে গর্জে ওঠে। বিভিন্ন স্থানে সভা তথা মিছিল হতে দেখা যায়। আওয়াজ ওঠে "বঙ্গ ভঙ্গ কোনমতেই নয়।" বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ গানটি জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয়। বন্দেমাতরম্ উচ্চারণের মাধ্যমে লোকেদের মধ্যে এক নবচৈতন্যের উন্মেষ ঘটে।

সেই আন্দোলন কেবল বঙ্গপ্রদেশেই সীমিত থাকল না। ভারতবর্ষের কোণে কোণে বন্দেমাতরম্ ধ্বনির সাথে আওয়াজ উঠতে লাগল "বঙ্গকে ভঙ্গ করতে আমরা কিছুতেই দেবো না। এটা কেবল বাংলারই প্রশ্ন নয়, সম্পূর্ণ দেশের প্রশ্ন। বন্দেমাতরম্। ভারতমাতাকী জয়।"

এ ধরনের আন্দোলনে ইংরেজ অধিকারীরা ক্রোধান্বিত হল। অত্যাচার চলতে থাকল। জবরদস্তি করা শুরু হল। অন্যায় আদেশের মাধ্যমে জানানো শুরু হল "ভারতমাতাকী জয় বললেই তাকে ভীষণ শাস্তি দেওয়া হবে।"

দেশভক্তির জোয়ার ইংরেজদের এই ভয়ে কিন্তু থমকে গেল না। গ্রাম গ্রামান্তরে তা ছড়িয়ে পড়লো। ভাবুক কেশবের মনে এর প্রভাব ভীষণভাবে দেখা দিল।

— ❖ —

সীমা অতিক্রম

১৯০৭ সালের অক্টোবর মাসের ঘটনা। লোকমান্য তিলকের ভাষণ সর্বত্র শোনা যাচ্ছে। দেশভক্তির হাওয়া সর্বত্র দেখা যাচ্ছে। এই পরিবেশের মধ্যে বিজয়াদশমীর উৎসবের দিনে কেশব রামপায়লীতে তার কাকা শ্রী আবাজী হেডগেওয়ারের কাছে পৌঁছালো।

কেশবের একটা বিশেষত্ব ছিল যে, সে যেখানেই যেত সেখানকার সমবয়স্কদের ভীষণভাবে আপন করে নিতে পারত। অল্পদিনের মধ্যে তারা কেশবের বন্ধু হয়ে যেত। রামপায়লীতেও তাই হল। অনেক বন্ধু সেখানে সে জোগাড় করে নিল। সকলের সাথে আলাপ আলোচনা করে দশহরা উৎসব খুব ধূমধামের সাথে পালন করা হবে এরকম একটা পরিকল্পনাও করে ফেলল।

মহারাষ্ট্রে দশহরা উৎসবের একটা বিশেষ মহত্ত্ব আছে এবং তাই তা মহাসমারোহে পালন করা হয়ে থাকে। সেই দিনে নতুন কাপড় পরিধান করে সকলে গ্রামের বাহিরে যায় ও 'সীমা উল্লঙ্ঘন' করে থাকে। শমীপূজনের পদ্ধতি সেখানে দেখা যায়। রাবণের পুতুল তৈরী করে তা জ্বালান হয়ে থাকে। শমী এবং আপটা গাছের পাতাকে সোনা হিসাবে মনে করা হয়। যেন সত্যি সত্যি রাবণকে হত্যা করে লংকা হতে সোনা লুট করে আনা হল, এই মনোভাব নিয়ে লোকেরা বাড়ী বাড়ী যায় এবং বড়দের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে এবং 'সোনা' দিয়ে থাকে এবং মিষ্টি খেয়ে থাকে।

রামপায়লীতে দশহরার দিনে সন্ধ্যের সময় সীমা উল্লঙ্ঘনের জন্য যখন সকলে রওয়ানা হল সেই সময় কেশব ও তার বন্ধুবান্ধবেরাও তাতে যোগ দিল। নিয়মমাফিক শমীপূজন হবার পরে সকলে যখন রাবণ জ্বালানোর জন্য এগুতে লাগলো তখন কেশব 'বন্দেমাতরম্' বলে চীৎকার করে উঠলো। সাথে সাথে তার বন্ধুবান্ধবেরাও বন্দেমাতরম্ বলে চীৎকার করে উঠলো। হঠাৎ ওখানকার পরিবেশ যেন কেমন পাল্টে গেল। সকলের মনে নবচৈতন্যের ভাবনা জেগে উঠলো। নিকটেই ছিল একটি ছোট্ট টিলা। কেশব তার উপর গিয়ে উঠলো এবং সকলকে সম্বোধন করে বললো—

"আজ নানা প্রকারের সীমাদ্বারা আমরা পরিবেষ্টিত। তা অতিক্রম করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। পরাধীনতা, দুর্বলতা, অজ্ঞানতা ও ব্যক্তিগত স্বার্থ দ্বারা আমরা পরিবেষ্টিত। এই সীমাবদ্ধতাকে আমাদের ভেঙ্গে ফেলতেই হবে। রাবণ প্রতিনিধিত্ব করে থাকে অন্যায়ের, জোরজবরদস্তির, ক্রূর সাম্রাজ্যবাদীর ও কুটিল রাজকর্মচারী সমূহের। তাকে আমাদের জ্বালাতে হবে। এটাকে পবিত্র দেশকাজ তথা দেবকাজ বলে মনে করা দরকার। বলুন বন্দেমাতরম্। ভারতমাতাকী জয়।"

সকলের মনে যেন উৎসাহের জোয়ার দেখা দিল। বালক ও কিশোরেরা উৎসাহের সাথে এগিয়ে চললো। রাবণকে ভেঙ্গে ছুঁড়ে ফেলা হল ও জ্বালানো হল। প্রভু রামচন্দ্র ও ভারতমাতার জয় বলতে বলতে সকলে নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে গেল।

সেই বছর রামপায়লীস্থিত লোকেরা গাছের পাতাতো পেলোই উপরন্তু পেলো এক নবচিন্তার খোরাক। সেই সময়ে রামপায়লীর লোকেরা পুরানো সীমা অতিক্রম করে প্রকৃতপক্ষে সীমা উল্লঙ্ঘনই সমাধা করলো।

— ❖ —

বন্দেমাতরম্

সারাদেশে ইংরেজরা নানা অন্যায় আইন চালু করেছিল। এমনকি পাঠশালার ছোট ছোট শিশুদেরও এই আইনের আওতায় আনতে দ্বিধাবোধ করেনি। লোকমান্য তিলকের মত মহাপুরুষের বক্তব্য শোনাও ছিল আইনত দণ্ডনীয়। দেশপ্রেম ও দেশভক্তি প্রচারে নিয়োজিত দৈনিক পত্রিকা পড়াও ছিল বারণ। সম্পূর্ণ জাতীয় সঙ্গীত গাওয়াতো দূরের কথা, সামান্য বন্দেমাতরম্ উচ্চারণ করাটাও ছিল জঘন্যতম অপরাধ। এটা অমান্য করলে ছাত্রদের বেত্রাঘাত করা হত, এমনকি অন্য শাস্তিও দেওয়া হত।

তখন কেশবের বয়স মাত্র ১৪। নাগপুরস্থিত নীলসিটী হাইস্কুলের সে ছাত্র। ইংরেজদের নানা ধরনের অযৌক্তিক ঘটনাগুলো শুনতে শুনতে তার মনে তুফান দেখা দেয়। ফলে সে একদিন নিজের বন্ধুদেরকে একত্রিত করে ও এক পরিকল্পনা রচনা করে। হৈ-হল্লোড়ের ফলে প্রত্যেক ক্লাশের যে মনিটার তারা তা জানতে পারে এবং তখন সে নিজেদের সাথীদের সামনে তা তুলে ধরে। সকলে ঠিক করে—"ঠিক আছে, তাই হবে।"

জনৈক স্কুল ইনসপেক্টর স্কুল পরিদর্শনে আসেন। প্রথমেই কেশবের ক্লাশে তিনি যান। ক্লাশে ঢোকামাত্রই সকলে একসাথে বন্দেমাতরম্ বলে চীৎকার করে ওঠে। সাথে সাথে পাশের ক্লাশ থেকেও সেই বন্দেমাতরম্ আওয়াজ শোনা যায়। অবশেষে সমস্ত ক্লাশ থেকেই সেই একই বন্দেমাতরম্ ধ্বনির আওয়াজ ভেসে আসে।

ইনসপেক্টর মহোদয়ের পরিদর্শনের কাজ সেখানেই থেমে গেল। রেগে তিনি আগুন হয়ে উঠলেন। চীৎকার করে জানতে চাইলেন, "এর মূলে কে আছে খুঁজে বার করুন। সকলকে কঠিন শাস্তি দিন। এ কাজকে কখনো বরদাস্ত করা যায় না।" ক্লাশের শিক্ষক এতে ঘাবড়ে গেলেন। আমতা আমতা করতে থাকেন। জী হুজুর, জী হুজুর করতে থাকেন। তিনি প্রধান শিক্ষককে বলেন, "এর মূলে কে, তা আপনাকে খুঁজে বার করতেই হবে। এটা কোনমতেই সহ্য করা যায় না। দোষীকে কঠিন শাস্তি দিতে হবে।" প্রধান শিক্ষক তখন অন্যান্য শিক্ষকদেরও সেই একই সাবধান বাণী শোনালেন।

ইনসপেক্টর মহোদয় রেগে আগুন হয়ে সেখান হতে চলে গেলেন। প্রধান শিক্ষক হাতে বেত নিয়ে চারিদিকে ঘুরতে থাকেন। প্রতি ক্লাশের প্রত্যেক শিক্ষক সব ছাত্রদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। "সত্যি করে বলতো, কে এসব করিয়েছে। এর মূলে কে আছে তা তোমাদের বলতেই হবে।"

কে দোষী তা বার করার জন্য প্রতিটি শিক্ষক চেষ্টা করে চললেন। প্রয়োজনে ভয় দেখালেন, ধমকালেন, লোভ দেখালেন, বেত মারলেন, থাপ্পড় মারলেন কিন্তু কেউ মুখ খুললো না। কেউই নেতার নাম বললো না। অবশেষে শিক্ষকেরা নিরাশ হলেন। প্রধান শিক্ষক সকল ছাত্রকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে বলেও ভয় দেখালেন। সেই সময় 'বন্দেমাতরম্' বলতে বলতে সব ছাত্র স্কুল থেকে বেরিয়ে গেল। প্রধান শিক্ষক মহোদয়ের অনুচিত ভাষা ব্যবহার করার প্রতিবাদে ছাত্ররা স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিল।

সেই সময় দেশের পরিস্থিতি এমনই ছিল যে, ছাত্রদের দ্বারা তৈরী পরিকল্পনা বেশীদিন চালানো সম্ভব ছিল না। পিতা বা অভিভাবকদের উপর চাপ আসতে লাগলো। অধিকারীরা নানা প্রকারের চাল চালনা শুরু করে পিতা তথা অভিভাবকদের বাধ্য করলেন ছাত্রদের স্কুল পাঠাতে। মাস দেড়েকের মধ্যে ছাত্ররা আবার নিয়মিত স্কুলে যাওয়া শুরু করলো। কিন্তু নায়ক কেশব আর সেই স্কুলে গেল না।

— ❖ —

এহেন শাসনকে ছুঁড়ে ফেল

উপরোক্ত ঘটনার পর কেশব কিছুদিন নাগপুরেই থাকল। পাড়ার প্রতিবেশীরা, আত্মীয় স্বজনেরা সকলে স্কুলে যাবার জন্য কেশবকে উপদেশ দিল। একজন বললেন—"ওটা এমন কি বড় কথা? ঠিক আছে ক্ষমা চেয়ে আবার স্কুলে যাওয়া শুরু কর।"

কেশব বললে—"কেন? আমি ক্ষমা চাইবো কেন? আমি এমন কি দোষ করেছি?"

সেই ভদ্রলোক আবার বললেন—"কি বলছ? তুমি বন্দেমাতরম্ বলোনি? অন্য সকলকে বন্দেমাতরম্ বলতে বলোনি? এটাতো সত্যি অন্যায় করেছ।" কেশব বলে ওঠে "কি বলছেন, নিজের মাকে বন্দনা করা অপরাধ?" ভদ্রলোক বললেন—"হ্যাঁ, নিশ্চয় সেটা অন্যায়। শাসকেরা যখন সেটাকে অন্যায় বলছে, তখন সেটা অন্যায় বই কি?" কেশব তখন দৃঢ়তার সাথে বলে উঠলো "আমি এ ধরনের শাসনকে মানি না, মানবো না। এ ধরনের অত্যাচারী শাসন ব্যবস্থাকে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে।"

কেশবের এহেন দৃঢ় বক্তব্য শুনবার পর সেই ভদ্রলোক শুধু তাকিয়ে থাকলেন। অন্যান্য যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তারাও কিন্তু একটু হকচকিয়ে গেল।

তাদের মধ্যে একজন বললো—"না বাবা, এধরনের ছেলের সাথে কথা না বলাই ভালো। না জানি, যে কোনদিন আমাদের বাড়ীতে কিছু অঘটন ঘটে যেতে পারে।" দ্বিতীয় জন বললো—"আরে ভাই, এরা সব আজকালের ছেলে, কোথা থেকে কী শুনে আসে আর তাই ছাড়তে থাকে।"

আত্মীয় স্বজনেরাও ঠিক এই ধরনের উপদেশ দিলো। কেশবও এর আগে সকলকে যা শুনিয়েছিল তাই তাদেরকেও শোনালো।

আবার কেশবকে কিছুদিনের জন্য ওর কাকার কাছে রামপায়লীতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সেখানে জনৈক ভদ্রলোক কেশবকে বললেন, "শোন খোকা, এখন তো তুমি খুবই ছোট। এই বয়সে পড়াশুনার দিকে বেশী মন দেওয়া দরকার। এখন থেকে দেশের কাজে মন দেওয়া কি তোমার ঠিক হয়েছে?"

ঝট করে কেশব বলে উঠলো—"আপনি একাজে হাত দেন নি বলেই আমাকেই তা করতে হচ্ছে। পড়াশুনা শেষ করে কয়জন দেশের কাজ করে বলতে পারেন? আপনি তো পড়াশুনা শেষ করেছেন, বয়সও তো আপনার হয়েছে, তবে কেন আপনি দেশ সেবার ব্রত গ্রহণ করছেন না? আপনি যদি এ দায়িত্ব স্বীকার করে নেন তবে আমি কথা দিচ্ছি আমি পড়াশুনা শেষ করেই এ কাজে হাত দেব।"

ভদ্রলোক চুপ করে থাকলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে এ ছেলে, যে-সে ছেলে নয়। তাকে যতই বোঝানো যাক না কেন সে কিছুতেই এ পথ থেকে বিচ্যুত হবে না।

— ❖ —

বিরাট আওয়াজ

একদিন রামপায়লীতে ছোট্ট একটি ঘটনা ঘটে যায়। সময়টা ছিল রাত্রিবেলা। সময় তখন রাত ৯টা। থানার পুলিশেরা তখন আরাম করছিল, কেউ কেউ গল্পেও মেতেছিল। হঠাৎ একটা ভীষণ আওয়াজ শোনা গেল। সকলে চমকে উঠলো।

সিপাহীরা ভাবলো কি হল, কোথায় হল? আশেপাশের লোকেরাও ভয় পেয়ে এদিক ওদিক চাওয়া-চাওয়ী করতে লাগলো। সকলের মনে একই প্রশ্ন "হল কি?"

ঘটনাটি ঘটলোই বা কোথায়?" পুলিশ অধিকারীরা এসে পৌঁছালে দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গেল। পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজও আরম্ভ হয়ে গেল। থানার নিকটস্থ দেওয়ালে দেখা গেল একটি গর্ত। পাশেই দেখা গেল একটি নারিকেলের খাপ পড়ে আছে। বারুদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ছোট ছোট কাঁটি ও কাঁচের টুকরা পড়ে থাকতে দেখা গেল।

কানাঘুসা শুরু হয়ে গেল। নীচু সুরে সবাই কথা বলতে আরম্ভ করলে। এই ছোট্ট গ্রামে এটা একটা চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়াল।

"কি ব্যাপার, কাল রাতে এধরনের আওয়াজ কি করে হল? আশে পাশের জঙ্গলে কি কোন শিকারী এসেছিল?"

"কি গো জানো না? এত বিরাট ঘটনা ঘটে গেল আর তোমার পাত্তাই নাই? কাল রাত্তিরে কেউ না কেউ থানার দেওয়ালে বোমা ছুঁড়েছিল? পুলিশের অধিকারীরা শত চেষ্টা করেও কোন কুল কিনারা করতে পারলো না।"

মনে হচ্ছে আমাদের রামপায়লীতেও বিপ্লবীদের কাজ শুরু হয়ে গেছে। আরে ভাই, একটু আস্তে বল, কেউ শুনতে পেলে অযথা ঝামেলায় পড়তে হবে।

চারিদিকে ভয় ও আতঙ্কের পরিবেশ। একে অপরের সাথে মেলামেশা বন্ধ তো করেইছে, কথাবার্তাও বলা বন্ধ হয়ে গেছে। পুলিশ কিছু ধর পাকড়ও করেছে, মারপিটও করেছে, কিন্তু কোন প্রকার সূত্র বার করা সম্ভব হয় নি।

কাউকে কোন কথা না বলেই, কেশবের কাকা আবাজী হেডগেওয়ার বুঝতে পেরেছিলেন এ কাজ আর কারো নয়, এ কাজ যদি কেউ করে থাকে তা করেছে তারই ভাইপো। পুলিশের মনে কোন প্রকার সন্দেহ জাগার পূর্বেই আবাজী কেশবকে নাগপুরে পাঠিয়ে দিলেন। অল্প দিনের মধ্যে কেশব আবার নাগপুর থেকে চলে গেল। ডাক্তার বালকৃষ্ণ শিবরাম মুঞ্জের নিকট থেকে একটা পরিচয় পত্র নিয়ে কেশব গিয়ে পৌঁছালো ইয়তমাল।

— ❖ —

ইয়তমালের পড়ার ঘরে

সেই সময় বিদর্ভ অঞ্চলের ইয়তমাল সহরটি দেশভক্তদের একটি মহত্ত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। লোকনায়ক বাপুজী আণে ইয়তমালেই থাকতেন। ডাঃ মুঞ্জের চিঠি নিয়ে কেশব বাপুজী আণের কাছে যায় এবং ওখানেই থাকা শুরু করে। তাঁরই কথামত কেশব সেই জাতীয় বিদ্যালয়ে যাওয়া আসা শুরু করে।

ইয়তমালে বাবাসাহেব পরান্‌জপে সেই জাতীয় বিদ্যালয়ের পরিচালক মণ্ডলীর প্রধান হিসাবে কাজ করতেন। তাঁর ত্যাগ ও সেবার জন্য ওখানকার লোকেরা তাঁকে তপস্বী উপাধিতে ভূষিত করেন। এই বিদ্যালয়ের জন্য পরানজপেজী গাঁয়ে গাঁয়ে ও ঘরে ঘরে গিয়ে চাঁদা তোলেন। ছোট ছোট কৃষকেরাও তাদের ফসল তথা তরিতরকারী সেই

স্কুলে পাঠিয়ে দিত স্কুলেরই কাজের জন্য। রাষ্ট্রসেবার আদর্শ বুকে নিয়ে কিছু কিছু শিক্ষিত যুবকও সেখানে এসে জুটে ছিল। বিনা বেতনে সেই স্কুলে পড়ান শুরু করে। স্কুলে ছাত্রদেরকে মানবতার শিক্ষা দেওয়া হত। প্রকৃত ধর্ম যে কি, তা সেখানে শেখান হত। মানুষ যাতে চরিত্রবান হয় ও তাদের জীবন যাতে সার্থক হয়, সে ধরনের শিক্ষাই ওখানে দেওয়া হত। তাই সেই স্কুলের নাম ছিল "বিদ্যাগৃহ"। কেশব সেখানেই পড়াশুনা শুরু করে।

স্কুল হত দুপুর এগারটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। যেহেতু বাপুজী আণের বাড়ীতে দুপুরে রান্না একটু দেরী করে হত তাই কেশবকে মাঝে মাঝে না খেয়েই স্কুলে যেতে হত। তথাপি সদাসর্বদা কেশবের মুখে হাসি লেগে থাকত এবং সব কাজ উৎসাহের সাথে করে যেত। গত দুবছর কেশবের একনাগাড়ে পড়াশুনা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তাই তাকে একটু বেশী করে পড়াশুনা করতে হয়। ফলে বেশ রাত্তির অবধি ওকে পড়াশুনা করতে হয়। তথাপি সকাল বিকাল নিয়মিত ব্যায়াম করা থেকে সে সরে যায়নি। জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি সে নিয়মিত পড়াশুনা করতো।

বাবাসাহেব পরান্‌জপের মতো মহাপুরুষের কাছাকাছি থাকার ফলে কেশবের জীবনে নানা সদ্‌গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। স্কুলে সব শিক্ষকেরাই দরদ দিয়ে ছাত্রদের পড়াশুনা করাতেন, ফলে ছাত্ররাও বেশ মন দিয়ে পড়াশুনা করে যেত। যার দরুন স্কুলের সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। গ্রাম গ্রাম থেকে স্কুলে সাহায্য আসতে লাগল। যে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে পারত না, সে শস্য দিয়ে সাহায্য করত। বিদ্যার্থীদের সংখ্যা দিন-প্রতিদিন বেড়েই যেতে লাগল। সেই স্কুলটি জাতীয়তাবাদ জাগরণের কেন্দ্র হিসাবে গণ্য হতে লাগল। বহু বাবা মা বা অভিভাবকেরা সরকারী স্কুল থেকে নিজেদের ছেলেকে তুলে এনে এই জাতীয়তাবাদী স্কুলে ভর্তি করা শুরু করলেন।

ইংরেজ অধিকারীরা এই স্কুলের এহেন উন্নতিকে খুব ভালভাবে নিতে পারলো না। নানা ধরনের চক্রান্ত করা শুরু করলো। যাদের ছেলেরা সেই স্কুলে পড়াশুনা করতো তাদের বাবা বা অভিভাবকদেরকে নানাভাবে বিরক্ত করতে লাগলো। তপস্বী বাবা সাহেব পরান্‌জপের উপর বিভিন্ন প্রকারের বিধি নিষেধ আরোপিত হতে লাগল। কোন প্রকার বক্তৃতা দেওয়া অপরাধ বলে বিবেচিত হল। অন্যান্য শিক্ষকদেরকেও ভয়ডর দেখানো আরম্ভ হলো। বাবাসাহেব পরানজপে ও তার সহকর্মীরা বেশ কিছুদিন ধরে এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকেন। পরিশেষে ১৯০৯ সালে এপ্রিল মাসে এই স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। কেশবকে তখন ইয়তমাল থেকে আবার চলে যেতে হল। কিন্তু অধৈর্য্য হয়ে পড়ল না। পুনায় গিয়ে পড়াশুনা সমাপ্ত করবে এটা মনে মনে ঠিক করে নিল। পুনায় চলে গেল এবং পুরো দুমাস জগদ্‌গুরু শংকরাচার্যের মঠে থাকল। রাতদিন সেখানে পড়তে লাগল। পরীক্ষার জন্য সে অমরাবতী গেল। সে এভাবে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাস করল।

— ❖ —

ডাক্তার হবার বাসনা

স্কুলের সর্বশেষ পরীক্ষায় ভালভাবে উত্তীর্ণ হয়ে কেশব যখন নাগপুরে ফিরে এল তখন তার হৃষ্টপুষ্ট শরীর, তেজস্বী পৌরুষ ও দেশাত্মবোধ দেখে মনে মনে খুশী সবাই হলো। সে যেখানেই যেত ওর থেকে বয়সে বড় লোকেরাও ওকে সমীহ করত। তখন থেকে সকলে ওকে কেশবরাও বলে সম্বোধন করতে শুরু করে।

কেশবরাও-এর বাড়ীর অবস্থা ছিল দারিদ্রে ভরা। অধিক পড়াশুনা করার বাসনা মনে মনে সে পোষণ করত কিন্তু আর্থিক অভাবের দরুন তা সম্ভব হবে কিনা তা ওর মনে উঁকিঝুঁকি মারতো। প্রতিদিন দুবেলা যেখানে বাড়ীতে পাতা পড়ে না সেখানে পড়ার জন্য অর্থই বা আসবে কোথা থেকে?

কিন্তু ইচ্ছা যদি তীব্র থাকে তবে পথও তার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে। মহাপুরুষেরা নিজেদের দেহ দ্বারা নয়, অনেকাংশে মন দ্বারা জয়ী হয়ে থাকেন। লক্ষ্য যদি স্থির থাকে এবং মনে যদি দৃঢ়তা ভর করে এবং পেটের জন্য সামান্য কিছু জুটে যায় তবে সে আনন্দের সাথে নিজ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। এক মুষ্টি চাল ও একঘটি জলই যথেষ্ট। কেশবরাও-এর অবস্থা ছিল ঠিক এরকমই।

নাগপুরের একটি স্কুলে সে শিক্ষকতা শুরু করে। তাছাড়া ছাত্র পড়িয়ে কিছু রোজগারের ব্যবস্থাও সে করেছিল। এইভাবে নিজের পরিবারকে কিছু আর্থিক সহায়তা করা ও আগামী দিনে নিজের পড়ার জন্য কিছু কিছু টাকা জমানোও আরম্ভ করে। নিজের পেটের জন্য সে অবশ্যই রোজগার করছিল কিন্তু পেটকেই সে সর্বস্ব বলে মেনে নেয়নি। ধীরে ধীরে ওর মনে দেখা দিতে লাগল যে সত্য-সত্য জীবনের লক্ষ্যটা কি? দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে সে ভাবনা চিন্তা শুরু করে দিল।

যদিও সে থাকত ছোট্ট একটি ঘরে এবং পুরানো নাগপুরের সংকীর্ণ গলিতে ঘুরে বেড়াত কিন্তু তার মন পড়ে থাকত সুদূর কোন এক উঁচু স্থানে। মনে মনে সে খুবই দুঃখ পেত কিন্তু পারিবারিক আর্থিক দুঃখ অপেক্ষা দেশের আর্থিক-হীনতার জন্যই সে অধিক বেদনাবোধ করত। তরুণ কেশবরাও স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখতে থাকে। কিভাবে দেশকে স্বাধীন করা যায় তার জন্য সে চিন্তাও করতে থাকে। চার-দেওয়ালে ঘেরা বিদ্যালয়ে পড়ানোর জন্য সে জন্ম নেয়নি, সে জন্মগ্রহণ করেছে পুরো দেশটাকে শিক্ষিত করার জন্য।

এই সময় লোকমান্য তিলকের অনুগামী ডাক্তার বালকৃষ্ণ শিবরাম মুঞ্জে তাকে নানাপ্রকারের সাহায্য করেন ও সাথে সাথে সঠিক মার্গদর্শন করেন। তাঁর সাথে আলোচনা করে কেশবরাও এল এম এফ ডাক্তারী পড়াশুনা করে ডাক্তার হবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। মুঞ্জে মহাশয়ের নিকট হতে পরিচয় পত্র নিয়ে সে ডাক্তারী পড়বার জন্য কলকাতায় যায়।

— ❖ —

বঙ্গভূমি

বঙ্গদেশ খুবই পবিত্র। ইহা চৈতন্য মহাপ্রভুর দেশ। এই দেশের ধূলিকণা গঙ্গাজলে ধৌত। সর্বত্র শুনতে পাওয়া যায় হরিবোল কীর্তন। এখানকার ছেলেরা মা দুর্গা ও মা কালীর আশীর্বাদ পুষ্ট। এখানেই ঠাকুর রামকৃষ্ণ ঈশ্বরভক্তির গোড়াপত্তন করেন। স্বামী বিবেকানন্দ তার উপর ভিত্তি করেই হিন্দুধর্মের প্রাসাদ গড়ে তুলেছেন। মন্ত্রপূত বন্দেমাতরম্ গানের প্রবর্তক ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র এখানেই জন্মগ্রহণ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মত নাট্যকারের জন্ম হয় এখানেই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, কেশবচন্দ্র সেন, অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত বিদ্বান্ ও বহু মহাপুরুষের জন্ম হয় এই প্রদেশেই।

শ্রদ্ধার ভাব নিয়ে কেশবরাও এল বাংলাতে। ডাক্তারী পড়ে মানবদেহের রোগ দূর করার জন্য এখানে এল না। এই মহান্ দেশ তার অতীত গৌরব কেন নষ্ট করে ফেলেছে, কেনই বা সে দুর্বল হয়ে গেছে এবং এই সমস্ত দুর্বলতা কি করে দূর করা যায়, এ প্রশ্নের উত্তর বাংলা দেশেই পাওয়া যাবে মনে করেই বাংলাতে এল। এই সুজলা সুফলা বঙ্গভূমিকে সে এই দৃষ্টিতেই দেখেছিল।

কেশবরাও কলকাতার অলিগলি ঘুরে বেড়াল। সমস্ত তীর্থক্ষেত্র তার দেখা হল। বিভিন্ন মহাপুরুষের সাথে সাক্ষাতও করল। নানান বিপ্লবীর সাথেও সে দেখা করল এবং আত্মশান্তির পথ দেখাতে পারে এমন মহাপুরুষদের চরণ দর্শন করতেও সে ছাড়ল না। বিভিন্ন পত্র পত্রিকার সম্পাদকের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল। ছোটবড় মিছিলে যোগদান করত। অতি শীঘ্র সেখানকার পরিস্থিতির সাথে সে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিল। বাংলার ভাবধারায় সে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হল। বাংলার সব কিছুকেই সে ভালবাসতে আরম্ভ করে। বাংলা ভাষা অতি শীঘ্র সে আয়ত্ত করে নেয় ও অনর্গল সেই ভাষাতে কথা বলার ক্ষমতাও অর্জন করে।

— ❖ —

ভোজনের ব্যবস্থা

কেশবরাও কলিকাতার ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। বিদর্ভ প্রান্তের অনেকে সেখানে পড়াশুনা করত। তাদের আর্থিক অবস্থা ভালই ছিল। কয়েকজন ছাত্র মিলে একখানা বাড়ী তারা ভাড়া নিয়েছিল। কেশবের মধুর ব্যবহারের জন্য তিনি সেই সমস্ত ছাত্রদের বন্ধু হলেন। বিনাপয়সায় কেশবরাও-এর সেখানে থাকার ব্যবস্থা সেই সমস্ত ছাত্র বন্ধুরা করে দিয়েছিল।

খাওয়া দাওয়া তিনি করতেন একটি হোটেলে। দু এক মাসের হোটেলের খরচ হয়তো জোগাড় হলেও হতে পারে কিন্তু তার পরে কি হবে, এই চিন্তায় তিনি খুবই চিন্তিত ছিলেন। তখন তাঁর মাথায় এক বুদ্ধি এল। হোটেলে যা তিনি খেতেন, তার

দ্বিগুণ খাওয়া শুরু করলেন। হোটেলের মালিক ছিল উত্তরপ্রদেশের। কেশবরাও-এর মধুর ব্যবহারে সে খুবই মুগ্ধ ছিল। তাই কেশবরাও-এর খাওয়া দাওয়ার প্রতি সে খুবই নজর রাখত। কয়েকদিন পর কেশবরাও হোটেলের মালিককে বললেন — "দাদা, এখানে এসে খেতে আমার খুব সময় নষ্ট হয় এবং পড়াশুনারও খুব ক্ষতি হয়। আমার খাওয়াটা কি আমার বাসায় পাঠাতে পারবেন?"

হোটেলের মালিক বললো — "না পারার কি আছে? ঠিক আছে পাঠিয়ে দেব। আমি নিজেই তোমাকে একথা বলবো ভেবেছিলাম। যখন তুমি খাও তখন সকলে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমার শুধু ভয় হয় যে, তোমার খাওয়া দেখে কারো নজর না লেগে যায়। এই পয়সায় তোমাকে তিনগুণ খাওয়া পাঠিয়ে দেব। যেরকম ডনবৈঠক করছ তা ঠিকমত চালিয়ে যাও। তোমার মত ব্যায়াম পূজারীকে আমার খুবই ভালো লাগে। ছোট বেলায় আমিও খুব ব্যায়াম করতাম।"

কেশবরাও-এর বাসায় খাওয়া আসতে লাগল। তিনি এবং তাঁর এক বন্ধু সেখানেই খাওয়া শুরু করলেন। বন্ধুটি কেশবের হোটেল খরচ দিতে থাকল। যতদিন কেশবরাও কলকাতায় ছিলেন এই ব্যবস্থাই সেখানে চালু ছিল।

— ❖ —

নির্ভয়তা

গ্রীষ্মকালে একবার কেশবরাও নাগপুরে এলেন এবং সেখান থেকে ইয়ৎমালে গেলেন। সেই সময় সেখানকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট একটা নিয়ম চালু করেছিল — তা হচ্ছে যে কেউ তার সামনে দিয়ে যাবে তাকে সেই ম্যাজিষ্ট্রেটকে সেলাম করতে হবে এবং করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

ঠিক সন্ধ্যার সময়, সেই ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ও সামনে উপস্থিত। ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়কে দেখা মাত্রই বন্ধুরা বলে উঠলো, "ভাই এঁকে প্রণাম কর। এটাই এখানকার নিয়ম।"

ডাক্তারজী তখন বন্ধুদের বললেন, "এটা কি ধরনের নিয়ম? নমস্কার কি জোর করে আদায় করা যায়?"

কেশবরাও প্রণাম না করেই যখন চলে যেতে লাগলেন তখন ম্যাজিষ্ট্রেটের সাথে ভ্রমণরত সরকারী কর্মচারীরা কেশবরাওকে ডেকে বললো, "ভাই, এঁকে প্রণাম কর। বড়দেরকে প্রণাম করাতো দরকার। এতে তো ক্ষতি নেই?"

রেগে কেশবরাও ইংরাজীতে বলে উঠলেন, "প্রণাম শুধু পরিচিত ব্যক্তিদেরই করা হয়। ইনি তো আমাদের পরিচিত নন, এমন কি আমাদের ধর্মের লোকও নন। ওঁর ব্যবহারও নাকি ভাল নয়। আর একটা কথা মনে রাখবেন প্রণামটা হচ্ছে শ্রদ্ধার বস্তু। এটা ভিক্ষে করে পাওয়া যায় না। জোর করে প্রণাম আদায় করা যায় না। নিজের ব্যবহারের মাধ্যমে তা পাওয়া যায়। অসৎ শ্রদ্ধা শেখানোও পাপ।"

সব চাটুকারেরা একথাগুলো শুনে থমকে গেল। ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় বললো, "যুবকটির কথায় সারবস্তু অবশ্যই আছে। মনে হচ্ছে এ অন্য জায়গার। দাও ওকে যেতে দাও।"

সেখানেই সে ঘটনার শেষ। ঐদিনে ইংরেজ অফিসারের সামনে দাঁড়াতেই সকলে ভয় করত। কেশবরাও-এর এহেন ঘটনা ইয়ৎমালে এক আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল।

— ❖ —

শত্রুকে মিত্র করার কৌশল

সেই সময় সর্বত্র বিদ্রোহীদের গুপ্ত সংস্থা সক্রিয়। সাহসী যুবকেরা একত্রিত হয়ে জগন্মাতা মা ভবানীর সামনে প্রতিজ্ঞা নিচ্ছে —"জীবনের বিনিময়ে আমরা দেশকে স্বাধীন করব। গুপ্ত পরিকল্পনা নিয়ে ইংরেজদেরকে আমরা খতম করব। নিজেদের গোপন কথা কাউকে খুলে বলবো না। যে আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। ব্যক্তিগত সুখের চিন্তা কখনোই করবনা। ভারতমাতার চরণে আমি আমার সর্বস্ব অর্পণ করছি।"

প্রতিজ্ঞা পূর্তির জন্য বোমা বানানোর শিক্ষা নেওয়া শুরু হল। বনে জঙ্গলে যাওয়া আসা শুরু হল। বন্দুক ও পিস্তল চালনার শিক্ষা ওরা নিতে লাগলো।

কেশবরাও ঠিক ঐ ধরনের একটি গুপ্ত সংস্থার সভ্য ছিলেন। ঐ সংস্থার তিনচার জন যুবক একদিন এক রসায়ণশাস্ত্রের প্রফেসরের কাছে যায়। গভীর রাত্রি পর্যন্ত ওদের অভ্যাস চলতে থাকে। ফেরার সময় সিঁড়িতে তারা এক ঘুমন্ত লোককে দেখতে পায়। পায়ের আওয়াজে ঘুমন্ত লোকটির ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং সে ভয়ে পালানো শুরু করে।

কেশবরাওয়ের এক বন্ধু তখন তার পিছু ধাওয়া করে। কিছু দূরে গিয়ে লোকটিকে সে ধরে ফলে এবং চড় থাপ্পড় মারে। মার খেয়ে লোকটি বলে ওঠে, "বিশ্বাস করুন আমি একজন চাকর। পেটের জন্য আমাকে এ কাজ করতে হচ্ছে।"

কেশবরাও তখন বন্ধুদেরকে বললেন —"ছেড়ে দাও, ওকে মেরো না, মনে কর সে আমাদেরই এক বন্ধু (ওর উপস্থিতির জন্যই আমাদের কোন খবর ইংরেজদের কাছে যায় না)। ওকে হাত করতে পারলে আমাদের লাভই হবে।"

গুপ্তচরটিকে নিকটস্থ একটি মিষ্টির দোকানে নিয়ে যাওয়া হল এবং ওরই পয়সায় সকলে মিষ্টি খেল। হাসি তামাসা করে সকলে সেখান থেকে চলে গেল। গুপ্তচরটি কেশবরাও-এর পা ছুঁয়ে বলে উঠলো —"মারের হাত থেকে আপনি আজ আমাকে বাঁচালেন। আজ থেকে আমি আপনার একান্ত সেবক হয়ে রইলাম।"

কেশবরাও-এর খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য ইংরেজ অধিকারীরা অনেক গুপ্তচর নিয়োগ করেছিল। কিন্তু কেশবরাও সেই গুপ্তচরদের চিনে ফেলতেন। কখনোই কেশবরাও এদের গালাগলি করতেন না। নিজের ব্যবহারের দ্বারা গুপ্তচরদেরকে তিনি হাত করে নিতেন। মানুষ চেনার দিক থেকে তিনি খুবই অভিজ্ঞ ছিলেন।

— ❖ —

সেবাকাজ

আমাদের দেশের প্রায় সব বড় বড় নদীগুলো এই বাংলা দেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থল এই বঙ্গদেশে। আবার এই দুই নদীতে মিশেছে এমন ছোট ছোট নদীও এখানে দেখতে পাওয়া যায়। দামোদর নদী তাদের মধ্যে একটি। বর্ষাকালে যখন বন্যা দেখা দেয় তখন এখানকার জনজীবনে দেখা দেয় সংকট।

১৯১৩ সালের কথা। ভয়ানক বন্যা দেখা দিয়েছে। যেদিকে তাকাও শুধু জল আর জল। গ্রামের পর গ্রাম, ক্ষেত ফসল ভেসে গেছে। কত পশু যে জলে ভেসে গেছে তার হিসেব নেই। হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে, লাখে লাখে ঘর ধসে পড়েছে। ইংরেজ রাজ কর্মচারীরা এ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। স্থানীয় লোকদের সুখদুঃখের কথা চিন্তা করতেও তারা রাজী নয়।

সারা প্রদেশে বন্যার তাণ্ডবলীলা শুরু হয়ে গেছে। কলকাতার পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে হাজারে হাজারে অন্নহীন, বস্ত্রহীন ও আশ্রয়হীন মানুষের দল। বাড়ী বাড়ী গিয়ে নিজেদের দুঃখের কাহিনী বলে যাচ্ছে। তাদের দুঃখে দুখী হয়ে শতশত যুবক সাহায্যার্থে এগিয়ে এল। কেশবরাও তাদের মধ্যে একজন। এই সময় পড়ায় নিজেকে মাতিয়ে রাখা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়লো। মানুষের দুঃখে ওঁর খাদ্যে অরুচি দেখা দিল। চোখের ঘুম যেন কোথায় পালিয়ে গেল। তিনি তখন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে সেবাকার্যে নিজেকে নিয়োজিত করলেন।

সেবাকাজের জন্য কেশবরাওকে শয়ে শয়ে গ্রামে যেতে হয়েছিল। পায়ে হেঁটে, নৌকায় তিনি ঘুরে বেড়াতেন। প্রয়োজনে সাঁতার কেটেও তাঁকে নদী পার হতে হয়েছে, সেদিন কাদার পথে পথে ঘুরে অন্নহীনদের মুখে অন্ন জুগিয়েছেন। কখনো কখনো চিঁড়ে মুড়ি ইত্যাদিও নিয়ে যেতে হয়েছে। ডুবন্ত বালক-বৃদ্ধদের জল থেকে তুলে ডাঙ্গায় নিয়ে গেছেন। জলে আটকে পড়া লোকদেরকে ছোট ছোট নৌকার সাহায্যে উদ্ধার করেছেন। সেই সময় তাঁর না ছিল কাপড়ের চিন্তা, না ছিল খাবারের চিন্তা, না ছিল ঘুমের চিন্তা। অধিকতর সময় তিনি ভিজা ও কাদা মাখা কাপড়েই দিন কাটাতেন। বসে পেট ভরে খাওয়া তাঁর কপালে সে সময় জোটেনি। দিনে দুই বা আড়াই ঘন্টা ঘুমোতে পারলে তিনি যথেষ্ট মনে করতেন।

শারীরিক বলে বলীয়ান কেশবরাও কখনো ক্লান্ত হয়ে পড়তেন না। নিরুৎসাহ হতে তাঁকে কেউ দেখেনি। বাংলা কথা ভালভাবেই বলতে পারতেন। গ্রামবাসীদের সেবার সময় নিজেকে সর্বপ্রকার অহঙ্কার থেকে মুক্ত রেখেছিলেন। 'পরের উপকার করছি' এ ভাবনা তাঁকে স্পর্শও করতে পারেনি। তিনি মাঝে মাঝে বলতেন— "এরা কি পর? এরা তো আমাদের ভাই, আমাদের আপন ভাই।"

ওদের সাথে কাজ করতে তিনি আনন্দ অনুভব করতেন। তাঁর আন্তরিকতা ও কর্মক্ষমতা দেখে কেশবের সহকর্মীরা তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করত। সকলে ওঁকে নিজেদের নেতা বলে মনে করত। তিনি যা বলতেন তা সকলে মেনে নিত।

— ❖ —

মানুষ না শয়তান

একটি দিনের ঘটনা। মেডিক্যাল কলেজের প্রফেসার অনুপস্থিত থাকায় ক্লাশের ছেলেরা এক একটি দলে বিভক্ত হয়ে নানা ধরনের গল্পে ব্যস্ত ছিল। কোথাও কোথাও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, আবার কোথাও পড়াশুনা নিয়ে। কেউ কেউ আবার চুপ করে বসে সময় কাটাচ্ছিল। সেই ক্লাশে একজন ছাত্র ছিল, যার নাম সুরেন্দ্র ঘোষ। সে ছিল লম্বা-চওড়া, গাট্টাগোট্টা এক যুবক। ডবলবার, সিংগলবার ব্যায়াম সে নিয়মিত করত। হঠাৎ সে কেশবরাও-এর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলতে আরম্ভ করলো— "কি হে হেডগেওয়ার, তোমার শক্তি সম্বন্ধে অনেক কিছু তো শুনতে পাচ্ছি। দেখিনা, সেটা কেমন। আমার বাহুতে কিল মারো দেখি।"

কেশবরাও বলে উঠলেন— "আপনি প্রথমে মারুন না। পরে আমি মারবো।"

ঘোষ রাজী হল। কেশবরাও তাঁর সুগঠিত বাহু ঘোষবাবুর সামনে তুলে ধরলেন। কিলমারা শুরু হল। ক্লাশের ছাত্রেরা সকলে কেশবরাওকে ঘিরে ফেললো। ঘোষবাবু কিল মেরেই চললো। কেশবরাও-এর নিশ্চল অবস্থা দেখে ঘোষবাবু পুরো শক্তি প্রয়োগ করে কিল মারতে লাগল। দশ, কুড়ি, ত্রিশ, পঞ্চাশ কিল মেরেও কেশবরাও-এর মুখ থেকে দুঃখজনক কোন শব্দ বার করতে পারলো না।

আশে পাশের সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল। সকলে একবাক্যে কেশবরাও-এর প্রশংসা করতে লাগল। ঘোষবাবু মারতে মারতে থেমে গেল কিন্তু কেশবরাওকে হটানো সম্ভব হলো না।

শেষে ঘোষবাবু হাত জোড় করে বললো, "আচ্ছা বলতো তুমি কে? মানুষ না শয়তান? এ শরীর চামড়া দিয়ে তৈরী না লোহা দিয়ে?" সকলে খিলখিল করে হেসে উঠলো। ঘোষবাবু কেশবরাও-এর সাথে হাত মিলাল এবং আলিঙ্গন করে বললো, মেনে নিলাম, সত্যি মেনে নিলাম। শিবাজীর দেশের লোকতো।"

— ❖ —

গুণ্ডারাই ভীত হল

বাহির থেকে মেডিক্যাল কলেজে যে সমস্ত ছাত্রেরা পড়তে এসেছিল তারা নিজেদের থাকার জন্য একটি ঘর ভাড়া করেছিল। সেখানেই তারা সকলে থাকত। মহল্লার কেউ কেউ ওদের ঐ বাড়ীতে থাকাটা ভাল চোখে দেখতো না। তাই তারা পিছনে গুণ্ডা লাগিয়ে ওদেরকে ওখান থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা করলো। রাত্তিরে বাড়ীটাতে পাথর পড়তে লাগল। ছাত্রদের মধ্যে যারা বড়, তারা এবিষয়ে পাড়ার কয়েকজনের সাথে কথা বলে এল। কথা বলার সময় বললো— "আপনাদের উপর ভরসা করেইতো আমরা এখানে আছি। কারো তো কোন ক্ষতি আমরা করিনা।" পাড়া প্রতিবেশীরা বললো— আপনারা আমাদের কষ্ট দিচ্ছেন। জানিনা ভাই, এ উৎপাত কে করছে বা কেনই করছে?

দ্বিতীয় দিন ও তৃতীয় দিনেও পাথর পড়তে থাকলো। তখন ছাত্রেরা সবাই একটু ঘাবড়ে গেল। একজন ছাত্র বললো— "আরে বাবা, কি বিরাট পাথর, মাথায় পড়লে আর বাঁচতে হবে না।" অপর একজন বলে উঠলো—দূর-দূর থেকে এই বিদেশে আমরা এসেছি। অযথা বিরোধ করে কি লাভ? জলে থেকে কুমিরের সাথে লড়াই করা কি সাজে?

তৃতীয় জন বললো—"জানো তো বাঙ্গালীরা ঝাড়-ফুঁক বিদ্যায় খুব পারদর্শী। না জানি এটা আবার এখন প্রয়োগ না করে বসে।"

চতুর্থজন বলে উঠলো—"পাড়ার লোকেরা যখন চাইছে না তখন এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়াই ভালো।" তখন কেশবরাও বলে উঠলেন—"ভয়ের কি আছে? এটা আমার উপর ছেড়ে দাও। দেখিতো, পাথর পড়া বন্ধ হয় কিনা।"

সেই রাত্রিতে যেমনই পাথর পড়া শুরু হল, হেডগেওয়ার দৌড়ে বাইরে এসে রাস্তায় দাঁড়ালেন। যাকেই সামনে পেলেন তাকেই তিনি ধরলেন ও মারতে শুরু করলেন। একজন চীৎকার করে বললো—"বাপরে, মরে গেলাম। বাঁচাও।" সেটা শুনে পাড়ার সকলে সেখানে জড়ো হয়ে গেল। কেশবরাও-এর উগ্র মূর্তি দেখে সকলে থমকে দাঁড়াল। তারপর তাদের মধ্যে থেকে দুএকজন কাছে এসে বলতে লাগলেন, "ভাই সাব, ইনিতো ভাল মানুষ। এঁকে এ ভাবে মারছেন কেন? ইনি আপনার কি ক্ষতি করেছেন?"

কেশবরাও মারা বন্ধ করলেন। উনি সকলের মাঝখানে এসে গর্জে উঠলেন, "আমি এ পাড়াতেই থাকি। আমার ঘরে পাথর পড়ছে। আর তোমরা সকলে কানে আঙ্গুল দিয়ে ঘুমিয়ে আছ? আমরা কি জানি বলে পাশ কাটাচ্ছ। এটা আমি কিছুতেই চলতে দেব না। আমার বাড়ীতে যে পাথর পড়ছে তার জন্য পাড়ার সকলেই দায়ী। এরপরেও যদি পাথর পড়ে, তবে যাকে দেখবো তাকেই পেটাবো।"

লোকেরা সব নিজের নিজের বাড়ী গেল। কেশবরাও-এর শক্তি ও সাহসের চর্চা সর্বত্র হতে লাগলো। এর পর থেকে পাথর পড়া বন্ধ হয়ে গেল।

— ❖ —

জিভ্ খুলে নেব

ঐ সময় কলকাতায় মৌলবী লিয়াকত হুসেন নামে এক নেতা ছিলেন। বয়স ছিল ষাট। কিন্তু উৎসাহ ও উদ্যমের দিক থেকে তিনি ছিলেন যুবক। তিনি লোকমান্য তিলকের পরম ভক্ত ছিলেন। কেশবরাও-এর ধৈর্য্য ও তেজস্বিতা দেখে মৌলবী লিয়াকত হুসেন কেশবরাও-এর প্রতি খুবই প্রসন্ন ছিলেন। বিশেষ এক ঘটনায় উভয়ের মধ্যে ভীষণ আত্মীয়তা গড়ে ওঠে।

একদিন এক জনসভায় কেশবরাও উপস্থিত ছিলেন। অহংকারী এক বক্তা সেই সভায় যা তা ভাষণ দিচ্ছিল। এমনকি লোকমান্য তিলকের নামের সাথে খারাপ বিশেষণ

প্রয়োগ করতে সে দ্বিধা করেনি। সবায়েরই সেটা খুব খারাপ লাগল। একজন ধীরে বললো "এটা বলা ঠিক হয়নি।" এতে কেউ ঘাড় নাড়াল আবার কেউ মাথা নীচু করে থাকলো। কিন্তু কেশবরাও চুপ করে থাকতে পারলেন না। দৌড়ে গিয়ে মঞ্চে উঠলেন এবং বক্তার মুখে সজোরে চপেটাঘাত করলেন। চারিদিকে সকলে হৈ হৈ করে উঠলো। বক্তার সমর্থকেরা কেশবরাওকে মারবার জন্য ছুটে গেল। কেশবরাও প্রথম জনের হাত ধরে এমনই ঝটকা দিলেন যে সে উল্টে গিয়ে নীচে পড়ল। দ্বিতীয় জনের হাত ধরে এমনই মোচড় দিলেন যে সে উহু উহু করতে করতে বসে পড়লো। তৃতীয় জনের কাঁধে এমনভাবে তিনি কিল মারলেন যে সে ল্যাজ গুটিয়ে সেখান থেকে দৌড় দিল। আর কেউ সেখানে এগুবার সাহস পায়নি এবং সভার সমাপ্তি সেখানেই ঘটল।

মৌলবী লিয়াকত হুসেন সব লক্ষ্য করছিলেন। তিনি সেখান থেকে উঠে এসে কেশবরাও-এর সাথে দেখা করলেন। কেশবরাও-এর পিঠে স্নেহের থাবা মারতে মারতে বললেন —"এইতো প্রকৃত নবযুবক। সাবাস ভাই, সাবাস। সত্যি আজ তুমি কামাল করে দিলে। আমিও তিলক মহারাজের একজন পরম ভক্ত। এখন থেকে আমরা কিন্তু একসাথেই কাজ করবো।"

এরপর কেশবরাও যতদিন কলকাতায় ছিলেন, উভয় উভয়েরই সাথে সহযোগিতা করে চলতেন। লিয়াকত হুসেনের আয়োজিত সভায় কেশবরাও-এর ভাষণ দেবার ব্যবস্থা অবশ্যই থাকত। মৌলানা লিয়াকত হুসেন কোন মিছিল বার করলে কেশবরাও তাঁর সাথীদের নিয়ে উৎসাহের সাথে তাতে যোগ দিতেন। সেই মিছিলে উঁচু দণ্ডে লাগান গেরুয়া ধ্বজ হাতে নিয়ে কেশবরাও আগে আগে চলতেন।

এ সমস্ত কাজে কেশবরাও অগ্রণী তো ছিলেনই, পড়াশুনার দিকেও তিনি ছিলেন অগ্রণী। পরীক্ষায় শতকরা ৬০/৬৫ নম্বর তিনি পেয়ে থাকতেন। সারাদিনে নানা কাজে তিনি মেতে থাকতেন কিন্তু রাত্তিরে একাগ্র চিত্তে একাকী পড়াশুনা করে যেতেন। ফলে সবকিছু তাড়াতাড়ি তিনি মুখস্থ করতে পারতেন। পড়াশুনা করার মত তাঁর কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা তো ছিলোই না এমনকি পড়ার সব পুস্তকও তাঁর পক্ষে যোগাড় করা সম্ভব হয়নি। তথাপি পড়াশুনায় কখনোই তিনি খারাপ ছিলেন না। তাঁর অসীম বুদ্ধিমত্তা ও কর্মক্ষমতা দেখে তাঁর সব সহপাঠীরা আশ্চর্য্য হয়ে যেত। যথাসময়ে কেশবরাও ডাক্তারী পরীক্ষায় ভালভাবেই উত্তীর্ণ হন।

— ❖ —

সুখাস্বাদনে আপত্তি ও অনীহা

ব্রহ্মদেশস্থ হাসপাতালের প্রধানের নিকট থেকে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল মহোদয় একখানা চিঠি পেলেন। তাঁর একজন ভাল ডাক্তারের দরকার। চিঠি পড়তে পড়তেই কেশবরাও-এর কথা তাঁর মনে হল। সাথে সাথে কেশবরাওকে ডেকে

পাঠালেন। কর্তব্যরত চাপরাসী কেশবরাওকে দেখেই ঘরের পরদা তুলে ধরল। বিনম্রতা সহকারে কেশবরাও বললেন, "মহাশয়, আমি কি ভিতরে আসতে পারি?"

প্রিন্সিপাল মহোদয় আনন্দ সহকারে বললেন, "আসুন হেডগেওয়ারজী আসুন বসুন। নানা কাজের মধ্যেও যে আপনি পরীক্ষায় ভালভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন এজন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আশীর্বাদ করছি আপনার ভবিষ্যত যেন উজ্জ্বল হয়।"

কেশবরাও বললেন—"মহাশয়, আপনাদের মত লোকের শিক্ষা দীক্ষার জন্যই, আমার মত একজন সাধারণ লোক এহেন খ্যাতি পেল। সেইজন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।"

প্রিন্সিপাল বললেন— "হেডগেওয়ারজী শুনুন, আপনার জন্য একটা বিরাট সুযোগ এসেছে। আপনি খুবই ভাগ্যবান। ব্রহ্মদেশের একটি চিকিৎসালয়ে একজন উৎসাহী ও যোগ্য ডাক্তারের দরকার। ওখানকার যে প্রধান সে আমার কাছে জানতে চেয়েছে। ওখানকার সব ব্যবস্থা খুব সুন্দর এবং বেতনও খুব ভাল। তাকে আপনার নাম আমি দিয়ে পাঠাচ্ছি।"

কেশবরাও বললেন—"মহাশয়, আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি ওখানে যেতে পারবনা।"

প্রিন্সিপাল আশ্চর্য্য হলেন ও সামান্য রাগও করলেন।—"এটা কি বলছেন? তড়িঘড়ি কিছু ঠিক না করাই ভাল। ভেবেচিন্তে বলবেন। এ ধরনের সুযোগ হাত ছাড়া না করাই ভাল। আমার মতে আপনার মত নির্ভীক যুবক যে কোন দেশের যে কোন স্থানে যেতে পারে। আমি এটাও জানি যে নিজস্ব ডাক্তারখানা চালাবার মত আবশ্যক সংগতি আপনার নেই। আমার ধারণা এত ভাল চাকুরি এদেশেও আপনি পাবেন না।"

কেশবরাও বললেন—"মহাশয় আপনাকে শ্রদ্ধা করি। আপনার উপদেশ আমার কাছে শিরোধার্য্য। কিন্তু আমি যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বিদেশে যেতে আমি ভয় করি না। পয়সা বেশী পাওয়া যাবে, না কম পাওয়া যাবে, সেটা নিয়েও আমি ভাবিনা। স্বদেশের সেবায় প্রথম থেকে আমি নিজেকে অর্পিত করেছি। দেহের প্রতিটি কণা ও জীবনের প্রতিটি ক্ষণ এই কাজেই আমি খরচ করতে চাই। চাকুরি কোন দিনই আমি করবো না। ডাক্তারখানা খুললেও হয়ত খুলতে পারি কিন্তু তার সম্ভাবনা খুবই কম। চারিদিকে এত কাজ পড়ে রয়েছে যে নিজের জন্য কিছু করার সময়ই আমার নেই।"

প্রিন্সিপাল তাকিয়ে থাকলেন। ভাবলেন, ছেলেটি কি ধরনের কথা বলে চলেছে? পয়সা রোজগার করার ওর সময় নেই?

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"তাহলে পেট কি করে চালাবেন? বউ ছেলেমেয়ের কি হবে? কেশবরাও বললেন—"আমি তো বিয়েই করিনি বা এই ধরনের কোন পরিকল্পনাও আমার নেই। আমার পেটের জন্য আমি ভগবানের উপর ভরসা করে আছি।"

প্রিন্সিপাল আবার বললেন—"ভাই, এখন আপনি যুবক, পৃথিবীটা তো দেখেননি। এ সময় সকলে আবেগপ্রবণ হয়ে থাকে ও কল্পনাজগতে ভাসতে থাকে। বিপদের সময় কিন্তু কেউ আর পাশে দাঁড়াবে না। তখন আপশোস করবেন, কেন আমি ঘর করলাম না, কেনই বা পারিবারিক জীবন স্বীকার করলাম না। সেই সময় বেশীর ভাগ লোকই

দিশেহারা হয়ে পড়ে ও পাপের পথে পা বাড়ায়। আমার এটা আন্তরিক কামনা যে আপনার জীবনে যেন এহেন দুঃসময় না আসে। আপনার অন্তরে যে দেশপ্রেম বিদ্যমান, তা দেখে আমি খুবই আনন্দিত। কিন্তু আমরা কি গৃহস্থের মত জীবন যাপন করে দেশসেবা করতে পারি না? আর আমাদের ব্যবসাও তো এক ধরনের জনসেবা। এরজন্য ঘরবাড়ী ছাড়ার কি বা প্রয়োজন আছে?"

কেশবরাও বলেন—"মহাশয়, আমাদের দেশের পরিস্থিতি এতই জটিল যে তাকে শুধরানোর জন্য আমার মত হাজার হাজার যুবকের নিজেদের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে এগিয়ে আসা দরকার। নগর, গ্রাম এবং বনে জঙ্গলে নানা ধরনের কাজের জন্য কার্যকর্তার খুবই প্রয়োজন। ভারত মা ত্যাগী সেবাব্রতী, বন্ধুভাবাপন্ন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্মীকে সাদরে আহ্বান করছেন। মার এই ডাকে সাড়া দিয়ে আমি আমার জীবনের লক্ষ্য ঠিক করে নিয়েছি।"

এ কথাগুলো শুনতে শুনতে অধ্যক্ষ মহোদয় একেবারে তন্ময় হয়ে গেলেন। ভাবে বিভোর হয়ে বললেন, "ডাক্তার হেডগেওয়ার, আপনার পথই উত্তম পথ। আপনি অসামান্য গুণের অধিকারী। সেগুলো দেশের কাজে লাগুক, আপনার উন্নতি হতে থাকুক। আপনার স্বপ্ন সত্য হোক, এই আমার শুভকামনা রইলো।"

কেশবরাও বললেন—"অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনার আশীর্বাদে আমি যেন সব সময় শক্তি পেতে থাকি ও আমার লক্ষ্য পথে এগিয়ে যেতে পারি।"

অধ্যক্ষ মহোদয় বললেন—"আমি সত্যি আপনাকে আন্তরিক আশীর্বাদ করছি।"

অধ্যক্ষ মহোদয়কে প্রণাম করে ডাক্তারজী বেরিয়ে গেলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে ডাক্তার কেশবরাও কলকাতা ছেড়ে নাগপুরে চলে এলেন।

— ❖ —

আমি ব্রতধারী

ডাঃ হেডগেওয়ার নাগপুরে এলেন কিন্তু বাড়ীতে গেলেন না। প্রধান কারণ, ডাক্তারজীর বড়দা মহাদেব শাস্ত্রী ডাক্তারজীর এ সমস্ত পরিকল্পনাগুলোকে আমলই দিতেন না এবং অহেতুক বলে মনে করতেন। তিনি ডাক্তারজীর বন্ধুবান্ধবকে বলতেন, "আরে, ওকে বলো, ওকে বোঝাও। ওর চাকরী করা দরকার, বিয়ে করা দরকার। পরিবারের দায়িত্ব নিয়ে সুখে থাকা উচিত। চাকরী যদি না করতে চায়, নাই বা করলো। দোকান টোকান খুলে তো বসতে পারে। কেবল হাঁ বলুক, তাহলে ঔষুধের দোকান খোলার জন্য যা টাকার দরকার তা কোন জায়গা হতে সংগ্রহ করে দেব। ওকে বলো, এ সমস্ত অনাবশ্যক কাজ করা যেন সে ছেড়ে দেয়। কোথা থেকে কি বিপদ ঘাড়ে আসবে তার কি কোন নিশ্চয়তা আছে? তখন এ সমস্ত বন্ধু-টন্ধু আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। দেশ ও দেশের কাজ হচ্ছে বড়লোকের। আমাদের মত সাধারণ লোকদের এ সমস্ত ঝামেলায় না পড়াই উচিত।"

মহাদেব শাস্ত্রীর ধারণা ছিল ঠিক এই ধরনের। উনি মনে করতেন প্রত্যেকটি লোকের উচিত প্রথমে নিজেদের পরিবারের জন্য চিন্তা করা। তাঁর স্বভাব ছিল অত্যন্ত উগ্র। কিন্তু তিনি জানতেন যে কেশব তাঁরই ভাই, সেও যে স্বাভাবিকভাবে তেজী ও দৃঢ়চেতা হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। সেই জন্য তিনি নিজে ডাক্তারজীকে কখনো কোন কথা বলতেন না। কিন্তু আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে প্রায় বলতেন—"আরে, ওকে একটু বোঝাও না।" ডাক্তারজী তাঁর দাদার সাথে বিনম্রতা সহকারে কথাবার্তা বলতেন। কখনো দাদাকে অনাদর করেননি। দাদার কথায় কখনো প্রতিবাদ করতেন না, তাঁর কাছ থেকে সরে যেতেন। ঝগড়া থেকে দূরে থাকার জন্য ডাক্তারজী বাড়ীতে খুব কমই থাকতেন।

সেই সময় হঠাৎ নাগপুরে প্লেগরোগের প্রকোপ বেশী করে দেখা দেয়। শহর ছেড়ে হাজার হাজার লোক অন্য জায়গায় চলে গেল। কিন্তু মহাদেব শাস্ত্রী বাড়ী ছেড়ে গেলেন না। অনেকে অনেকভাবে তাঁকে বোঝাল। কিন্তু তিনি বলতেন—"শুনছেন, সরে দাঁড়ান, আমাদেরকে কষ্ট দেবার ক্ষমতা কি প্লেগের আছে?" ডাক্তারজীও তাঁর দাদাকে বাইরে চলে যাবার জন্য বলেন তথাপি তিনি তা শোনেন নি। অতএব শেষে যা হবার তাই হল। তিনি প্লেগে আক্রান্ত হলেন। গায়ে প্রচণ্ড জ্বর এল। ডাক্তারজী খুব দৌড়াদৌড়ি করলেন। চিকিৎসাও করান হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু লাভ হল না। মহাদেব শাস্ত্রী মারা গেলেন।

প্লেগের সমাপ্তি ঘটল। সকলে আবার পাড়ায় ফিরে এল। সীতারামপন্ত এবং কেশবরাও নিজের বাড়ীতে ফিরে এলেন। বাড়ীর অনেক জিনিষপত্র এই সময় চুরি হয়ে যায়। মহাদেব শাস্ত্রীর অভাব সকলে মর্মে মর্মে অনুভব করতে লাগল। সীতারামপন্ত পুরোহিতগিরি শুরু করলেন। তাঁর বিয়ে হল। আত্মীয়-স্বজনেরা, দূর ও নিকটস্থ মেয়ের বাবারাও সীতারামপন্তের নিকট কেশবারও-এর খোঁজ খবর নিতে আরম্ভ করল। সীতারাম বিয়ের ব্যাপারে কেশবরাওকে প্রশ্ন করলে কেশবরাও বলেন, "এখন বিয়ে করবো না। রুজি রোজগারের ব্যবস্থা আগে করি, তখন দেখা যাবে।" ধীরে ধীরে খোঁজ খবর নেওয়ার লোকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। অনেকে রামপায়লীতে গিয়ে তাঁর কাকার সাথে দেখা করে। আমরা এত যৌতুক দেবো, এ দেবো, ও দেবো। কথা চলতে থাকে। তখন কেশবরাও নিজের বন্ধুকে বললেন ও কাকাকেও লিখে পাঠালেন, "আমি আজন্ম দেশ সেবার ব্রত নিয়েছি। সুতরাং আমার এই সমর্পিত জীবনে না আছে নিজের সুখ না আছে পরিবারের। দেশের কাজে হয়তো কখনো জেলে যেতে হবে কখনো প্রাণও যেতে পারে। আরও নানা প্রকারের সংকটও দেখা দিতে পারে। এই অবস্থায় জেনে শুনে কোন মেয়ের জীবন নষ্ট করার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করি না।"

সুতরাং বিয়ের আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল। সীতারামপন্তের ব্যবহার খুবই সুন্দর ছিল। তিনি ডাক্তারজীকে খুবই স্নেহ করতেন। তাঁর উপর অসীম বিশ্বাস ছিল। যেটুকু জুটতো তা দুভাই আনন্দে ভাগ করে খেতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে ডাক্তারজী এমন বিভিন্ন কাজে জড়িয়ে গেলেন যে বাড়ীতে তিনি খুব কম সময় থাকতে লাগলেন।

— ❖ —

গুপ্ত যোজনা

ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। স্থানে স্থানে ইংরেজরা যুদ্ধে হেরে যাচ্ছে। ভারতে ইংরেজদের সৈন্য সংখ্যা খুবই কম ছিল। দেশের বিপ্লবীরা মনে করলেন এই হচ্ছে প্রকৃত সময়। ইংরেজদের সংকটাপন্ন অবস্থার মধ্যে আমাদের লাভ উঠাতে হবে। ভারতের স্বাধীনতার জন্য সারা দেশে এক সাথে কাজ করা উচিত। বাংলাতে পরিকল্পনা নেওয়া হল। বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন কার্যকর্তার নিযুক্তি হল। মধ্যপ্রদেশ ও বিদর্ভের আন্দোলন চালাবার দায়িত্ব পড়ল কেশবরাও হেডগেওয়ারের উপর।

নাগপুরে ভাউজী কাবরে নামে একজন কবিরাজ ডাক্তারজীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। উভয়ে একত্রে বিচার বিনিময় ও কাজ করতেন। নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাঁরা সদাসর্বদা ঘুরে বেড়াতেন ও কার্যকর্তাদের গুপ্ত রীতিতে একত্রিত করতেন। বিয়ে, পৈতে বা ছোটখাটো যে কোন ধার্মিক অনুষ্ঠানে তাঁরা অংশ নিতেন। পরিচালকদের সর্বপ্রকার সাহায্য করতেন ও এই সুযোগে নূতন নূতন ছেলেদের সাথে পরিচয় করে নিতেন। তাদের মধ্যে দেশ প্রেম জাগানো ও ইংরেজদের প্রতি ক্ষোভ জন্মান, দুটো কাজই তাঁরা করতেন। ফলে অতি অল্পদিনের মধ্যে মধ্যপ্রদেশ ও বিদর্ভে তেজস্বী যুবকদের এক গুপ্ত সংগঠন তৈরী হল। যথেষ্ট টাকা পয়সা যোগাড় হলো। বন্দুক এবং পিস্তল তৈরী করবার ছোট কারখানা চালু হল। গ্রাম থেকে দূরে ঘন জঙ্গলে বন্দুক ও পিস্তল চালনা শিক্ষা করার শিক্ষা-কেন্দ্র শুরু হল।

নাগপুরের নিকটে কামটী নামে একটি স্থান আছে। সেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সৈনিক শিবির ছিল। সেখানকার সৈনিক অধিকারীদের সাহায্যে বিপ্লবীরা বহু অস্ত্র সংগ্রহ করেছিল। ওদের মাধ্যমে বিপ্লবীরা নানা ধরনের খবরাখবর জোগাড় করত। একবার জানা গেল যে একটা গাড়ী করে বহু গোলাবারুদ কোন জায়গায় পাঠান হচ্ছে। সাথে সাথে বিপ্লবীরা এক পরিকল্পনার ছক তৈরী করল। নাগপুর ষ্টেশনে গাড়ীটাকে দাঁড় করান হল। সৈনিক অধিকারীরা গাড়ীর নিকট গিয়ে পৌঁছাল। কর্তব্যরত রক্ষীরা সাথে সাথে ওদের অভিবাদন জানাল ও স্বাগত জানল। অধিকারীদের নির্দেশানুসারে কয়েকটি বাক্স নীচে নামান হল। মোটরে তোলা হল। মোটর সেখান থেকে চলে গেল। তখন রেলকর্মচারীদের মনে সন্দেহ দেখা দিল। খোঁজটোজ নেওয়া শুরু হল যে এরা কারা? কয়েকটি বাক্স কেনই বা নামাল? বাক্সগুলো গেলই বা কোথায়? পুলিশ কর্মচারীরা অনেক অনুসন্ধান করেও কোন কুল কিনারা করতে পারলো না। ডাক্তারজীর পরিকল্পনার মধ্যে কোন প্রকার খুঁত থাকতো না। ছোট ছোট প্রশ্নের বিচার তিনি পূর্ব থেকেই করে নিতেন এবং তদনুসারে পরিকল্পনা রচনা করতেন।

এই সময়ের কথা। কয়েকজন লোককে গোয়া পাঠান হল। ইউরোপ থেকে একটি জাহাজ আসার কথা ছিল। বিপ্লবীদের জন্য কিছু অস্ত্রশস্ত্র তাতে পাঠান হয়েছিল।

ঐ সময় ছোটবড় সমস্যা নিয়ে কেশবরাও ডাঃ মুঞ্জের সাথে আলোচনা করতেন। একবার কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে ডাঃ মুঞ্জে একটা চিঠি দিয়ে

তাঁকে লোকমান্য তিলকের কাছে পাঠান। তিনি লোকমান্য তিলকের সাথে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন ও নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। কেশবরাও-এর সাথে কথাবার্তা বলে ও তাঁর আচরণ দেখে তিলকজী খুবই প্রভাবিত হন। তখন কেশবরাওকে তিনদিনের জন্য তিলকজী নিজের বাড়ীতে রাখলেন ও তাঁকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন।

পুনার ঐতিহাসিক স্থানগুলো দেখে কেশবরাও গেলেন শিবনেরী দুর্গে। এখানেই ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের জন্ম হয়। কিন্তু স্থানটি অবহেলিত ও উপেক্ষিত হয়ে রয়েছে। দেওয়ালগুলো সব পড়ে গেছে। ধ্বংসস্তূপ কেবল দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ দেখে ডাক্তারজীর মনে খুব দুঃখ হল। তিনি মনে মনে ভাবলেন "হায়-হায়, এই মহাপুরুষের জন্মস্থানের এহেন দুর্দশা! কিন্তু এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে? যেমন সমাজের অবস্থা তেমনই তো হবে পূজো স্থানের অবস্থা!"

— ❖ —

বিষও যিনি হজম করলেন

১৯১৮ সাল। বিশ্বযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। জার্মানীর পরাজয় ঘটেছে। ইংরেজরা জয়ী হয়েছে। তাই অহংকারের মাত্রাও গেছে বেড়ে। যুদ্ধে গেছে এমন সব ইংরেজ সৈন্যরা আবার ভারতে ফিরে এসেছে। ভারতীয়দের সাথে দুর্ব্যবহার শুরু করলো ইংরেজ অধিকারীরা। অযৌক্তিক আইন চালু হল। দেশের স্বাধীনতার জন্য যারা একটু সক্রিয় ছিল তাদেরকে ধরে ধরে জেলে ঢোকান হল। বহু পত্রিকা সম্পাদককেও ধরা হল। তাদের দৈনিক পত্রগুলো বন্ধ হয়ে গেল। বিপ্লবীদের যারা নেতা তাদেরকেও ধরা হল। গুপ্ত সংস্থাগুলো সুপ্ত হয়ে গেল। বোমা তৈরী করাতো দূরের কথা ইংরেজদের বিরুদ্ধে কথা বলাও বন্ধ হয়ে গেল। চারিদিক নিরাশায় ছেয়ে গেল। সমাজে অকর্মণ্যতা দেখা দিল। সকলে ভয় পেল, ঘাবড়িয়ে গেল। শিক্ষিত লোকেরা বলতে লাগল, "ইংরেজদের রাজত্ব আমাদের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ। ইংরেজদের উপর ঈশ্বরের কৃপা আছে। ওদের বিরুদ্ধে কিছু করার অর্থই হচ্ছে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হওয়া।"

ডাক্তারজীর জনৈক সহকর্মী তাঁকে বললো—"ডাক্তার আপনার মধ্যে তো কোন হতাশার ছাপ দেখা যাচ্ছে না। বড় বড় বুদ্ধিমান লোকেরা তো কাঁদো কাঁদো মুখে হাতের উপর হাত দিয়ে বসে পড়েছে। দেশসেবা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু আপনি শুধু ব্যতিক্রম। স্বাধীনতার সুখ স্বপ্নে এখনও আপনি বিভোর, কেন বলুনতো?"

ডাক্তারজী তাকে বললেন— "আমরা সব সময় বলে এসেছি যশ পেতে হলে অপযশকে স্বীকার করে নিতে হবে। এটা কি শুধু কথার কথা? সাধ্য অপেক্ষা সাধনের প্রতি যাদের বেশী টান তারা দুর্নামের সম্মুখীন হওয়া মাত্রই নিরাশ হয়ে পড়ে। সাধ্যর প্রতি যার অগাধ নিষ্ঠা, সে কখনো নিরাশ হয় না। তারা নূতন নূতন পথ বার করে নেয়।

নদীর জলপ্রবাহ কখনো পাহাড় ভেঙ্গে পাহাড়ে চক্কর খেয়ে এগিয়ে যায় আবার প্রয়োজনে বালুতে আটকেও যেতে দেখা যায়। আমরাতো ভগবান শিবের উপাসক। তিনি তো বিষ পান করে তা একেবারে হজম করে নিয়েছেন, আর আমরা এ সামান্য অপযশকে হজম করতে পারবো না?"

হজম আমাদের করতেই হবে। অপযশের কারণ আমাদের খুঁজে বার করতেই হবে। আগামী দিনে আমাদের যাতে কোন ত্রুটি না থাকে তার দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। এ ধরনের নানা আলোচনা ও বিচার-বিনিময় যদি করতে থাকি তাহলে কোন না কোন দিন সঠিক রাস্তা তা থেকে বেরুবেই বেরুবে।

— ❖ —

ভবিষ্যতের চিন্তা

১লা আগষ্ট ১৯২০ সাল। লোকমান্য তিলক মারা গেলেন। ঐ বছর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস অর্থাৎ ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সভার বার্ষিক অধিবেশন নাগপুরে তিলকজীর অধ্যক্ষতায় হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তিলকজীতো আর নেই। এখন কি করি? একমাত্র বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ও প্রভাবশালী নেতা চলে গেলেন। এখন কি হবে? সকলে নিরাশ হয়ে পড়লো কিন্তু ডাক্তারজী দ্বিগুণ উৎসাহে অধিবেশনের কাজে মেতে উঠলেন।

অধিবেশনের কাজে তাঁকে অনেক সময় গ্রামে যেতে হত। আন্দোলনের বিভিন্ন কাজে পুরো প্রদেশটাই তিনি চষে বেড়িয়েছেন। হাজার হাজার যুবকদের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। সাথে আন্তরিকতাও। সবকিছুই গোপন রাখতে হত। এখন কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে ঘোরা ফেরা করছেন। যুবকদের সাথে মেলামেশা করা, দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত করা প্রভৃতি কাজগুলো ডাক্তারজীর খুব প্রিয় ছিল।

ডাক্তারজীর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে নাগপুরে কিছু উৎসাহী যুবক বিশেষ এক প্রস্তাব তুলে ধরল। তখন থেকে ঠিক হলো কংগ্রেস অধিবেশনের সাথে সাথে মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদেরও সম্মেলন হবে। গোখলে নামে এক উৎসাহী যুবক এই কাজের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিলেন।

গোখলেজী কাজতো শুরু করলেন কিন্তু কর্মীর অভাব প্রত্যক্ষ করে হতাশ হলেন। বড় আশা নিয়ে তিনি নেতাদের কাছে গেলেন কিন্তু কেউই গোখলেজীকে পাত্তা দিলেন না।

যুবকদের সম্মেলনকে তারা সকলে নগণ্য বলে মনে করত। বড়বড় বিষয়, লম্বা চওড়া প্রস্তাব এবং দীর্ঘ ভাষণ এগুলোর প্রতি তাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। আগামী দিনের লোকজন সম্বন্ধে তাঁরা ছিলেন উদাসীন। ভবিষ্যত নিয়ে ভাববার সময় তাঁদের নেই। এসব দেখে গোখলে মনে মনে খুব দুঃখ পেলেন।

সর্বশেষে তিনি গেলেন হেডগেওয়ারজীর কাছে। ডাক্তারজী তাঁকে কলকাতা থেকে বোম্বে, লাহোর থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত সব বড়বড় শহরে বাস করে এমন বিভিন্ন কার্যকর্তার এক নামের তালিকা দিলেন। দিলেন নানান ঠিকানা। অনেকের নামে ব্যক্তিগত পত্র?

দিলেন। বিভিন্ন লোকের সাথে ডাক্তারজীর এহেন পরিচয় দেখে গোখলেজী একটু আশ্চর্য্য হলেন। অবশেষে জানতে চাইলেন "আপনি তো কামাল করে দিয়েছেন। এত সব কি করে মনে রেখেছেন?"

কৌতুকের সাথে ডাক্তারজী বললেন—"কেন না, এ কাজের জন্য আমি আমার মাথাতে আপনার জন্য একটা কার্যালয় খুলে রেখেছি।"

গোখলেজী বললেন—"ডাক্তারজী, আজ পর্য্যন্ত অনেক বড়বড় নেতার সাথে আমি দেখা করেছি, কিন্তু না কেউ এ ধরনের তৎপরতা দেখিয়েছে না সঠিক কোন পথ বলেছে। এ ধরনের আত্মীয়তা ও আন্তরিকতা আমি কোথাও পাইনি।"

ডাক্তারজী হাসিতে ফেটে পড়লেন।

— ❖ —

আদালতে

১৯২১ সাল। সর্বত্র অসহযোগ আন্দোলন চলছে। এই হেতু ডাক্তার হেডগেওয়ার বিদর্ভ প্রান্তের বহু নগর বা গ্রামে যান। ভাণ্ডারা, খাপা, কেলবদ্ তেলগাঁও, দেওলী, ওয়ার্ধা প্রভৃতি স্থানে তাঁর গরমগরম ভাষণ হয়। ভাষণে ইংরেজদের বিরুদ্ধে উগ্র শব্দ ব্যবহার করতে তিনি দ্বিধা বোধ করেন নি। ইংরেজরা নানা ধরনের বিধি নিষেধ তাঁর উপর চাপিয়েছিল। কিন্তু ডাক্তারজী তা কখনো মেনে নেন নি। ঝড়ের বেগে তিনি ঘুরতে থাকেন। ছোট বড় গ্রামে গিয়ে দেশের প্রতি নিজেদের কি কর্তব্য তা বোঝাতে থাকেন।

অবশেষে ইংরেজরা তাঁকে আটক করে ও তাঁর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালায়। অপরাধ স্বীকার করে নেওয়াই ছিল অসহযোগ আন্দোলনের রীতি। উকিল মোক্তার লাগানো চলতো না। ডাক্তারজী কিন্তু তা অস্বীকার করে উকিল নিযুক্ত করাই উচিত মনে করলেন।

নাগপুরের অনেক উকিলের সাথে ডাক্তারজীর ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। সকলে তাঁর পক্ষে দাঁড়াতে সম্মত হলেন। সেই সময় নাগপুর কোর্টে যে বিচারক ছিলেন তাঁর নাম ছিল স্মেলী। স্বভাবে ছিলেন উগ্র। উকিলদের তিনি খুব অপমান করতেন। তা বন্ধ করার জন্য তার প্রতিবাদে সব উকিলরা তাঁর আদালতে আসা বন্ধ করে দিলেন।

তখন ডাক্তারজী নিজেই নিজের মকদ্দমার কাজ চালান। ডাক্তারজীর ভাষণের উপর ভিত্তি করে ইংরেজ অধিকারীরা তাঁর উপর রাজদ্রোহের আরোপ লাগালো। সরকারী সাক্ষীদের নানারকম প্রশ্নের মাধ্যমে তিনি তাদেরকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করলেন। অবশেষে আদালতের সামনে তিনি বললেন—"আমার ভাষণের যে অংশ আদালতে পেশ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভুল ও বিকৃত। আমি আমার বিভিন্ন ভাষণে জনতার সামনে যা বলেছি তা অত্যন্ত সাধাসিধে এবং সরল। আমাদের দেশ পরাধীন। তাকে স্বাধীন করা আমাদের লক্ষ্য। প্রত্যেক ভারতবাসীর এটা কর্তব্য। তার জন্য তাদের সচেষ্ট থাকা

দরকার। শাসকেরা অত্যন্ত দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন ও কুটিল। আমাদের কথা তারা বুঝবে না, বা বোঝবার চেষ্টাও করবে না। ইংরেজদের তৈরী আদালতে কি ন্যায় বিচারের আশা করা যায়? এতো বিচারের প্রহসন মাত্র। ভারতে ইংরেজদের রাজত্ব ন্যায়ের উপর আধারিত নয়, আধারিত পাশবিক বলের উপর। দেশের লোকদের দ্বারা চালিত শাসনইতো প্রকৃত শাসন। অপরের শাসন তো চোর, লুটেরাদের তথা ধোকাবাজদের শাসন। আমি আমার ভাষণের মাধ্যমে বন্ধুদের মনে স্বদেশপ্রেম জাগাতে থাকি। বর্তমান রাজকর্তারা যদি এর বিরোধ করে তাহলে ওদের বোঝা উচিত যে ওদের দিন শেষ হয়ে এসেছে, শীঘ্রই পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে ওদেরকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। আমার ভাষণের মাধ্যমে দেশপ্রেমিকদের শুধু সজাগ করেছি। এটা করা আমি আমার কর্তব্য মনে করি।"

ডাক্তারজীর ভাষণ শুনে বিচারক স্মেলী বলেন, "দৈনিক কাগজে ছাপা তোমার বক্তৃতার সারবস্তু অপেক্ষা বর্তমানে দেওয়া তোমার ভাষণখানি আরও উগ্র বলে মনে করি। উগ্রতার প্রমাণ পাবার জন্য আর অন্য কিছু দেখার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।"

স্মেলী মহোদয় ডাক্তারজীকে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

— ❖ —

বিদায়

ডাক্তারজীর অনেক বন্ধু আদালতের বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। ডাক্তারজীকে বাইরে আনা মাত্র ওঁরা সব পাশে এসে দাঁড়ালেন। সকলে ডাক্তারজীকে মালা পরালেন ও নানা জয়ধ্বনি দিলেন। শয়ে শয়ে লোক সেখানে জড়ো হয়ে গেল। ডাক্তারজী ওদের সামনে ছোট্ট একটি ভাষণ দেন। তিনি বলেন—

প্রিয় বন্ধুগণ, আমরা সকলে দেশ সেবার ব্রত নিয়েছি। এটা কিন্তু কঠিন ব্রত। বিরাট শত্রুর মোকাবেলা আমাদের করতে হবে। সব রকম বিপদকে হাসতে হাসতে বরণ করে নিতে হবে। "সমুদ্রে পেতিছি শয্যা, শিশিরে কিবা ভয়?" জেলের কথা কি বলছেন? প্রয়োজনে ফাঁসীতে ঝুলব। কিন্তু মনে রাখতে হবে এসবই আমাদের কাছে সাধনাসম। সাধনাকে সম্বল করে আমাদের স্বাধীনতা আনতে হবে। অনেক সময় সাধ্য অপেক্ষা সাধনকেই অধিক মূল্য দিয়ে থাকি। এ ভুল যেন আমরা না করি।

দৃঢ়তার সাথে আমরা যদি আমাদের কাজ করে যাই তবে এটা নিশ্চিত যে বিদেশীরা এখান থেকে চলে যাবে বা যেতে বাধ্য হবে। এখানে উপস্থিত হয়ে যাঁরা আমাকে স্নেহভালবাসা দেখালেন তার জন্য সত্যি আমি কৃতজ্ঞ। আবার একবছর পর সকলের সাথে দেখা হবে।

সকলে তালি বাজাল, "ভারত মাতাকী জয়", "ডাক্তার হেডগেওয়ারজী কী জয়" ধ্বনিতে চারিদিক কেঁপে উঠলো। ডাক্তারজী করজোড়ে সকলকে নমস্কার করলেন এবং পুলিশের সাথে ওখান থেকে চলে গেলেন।

— ❖ —

কারাবাস

জেলে যাবার পর অনেক বড়বড় নেতা ঘাবড়িয়ে যান। জেলের বাহিরে থাকার সময় স্নেহভালবাসা বড়বড় কথা ও বড়বড় গল্প বলেই থাকেন কিন্তু ভিতরে যাবার পর সব যেন কেমন চুপসে যায়। কেউ কেউ আবার একটু ভাবুকে রূপান্তরিত হয়ে যান। ছোট ছোট কারণে খিটখিটে হয়ে যান আবার রেগেও যান। অনেকে বাড়ীর চিন্তায় কষ্ট পান। পরোপকার ও ত্যাগের প্রচার করনেওয়ালা লোক ভিতরে গিয়ে কেমন যেন স্বার্থপর ও লোভী হয়ে যান।

ডাক্তারজী এর পূর্বে কখনো জেলে যাননি। কিন্তু জেলের সম্বন্ধে উনি অনেক কিছু পড়াশুনা করেছিলেন ও অনেক কিছু জানতেনও। জেলের জীবন যে কত কঠিন সে সম্বন্ধে তিনি মানসিক তৈরী ছিলেন। আর এমনিতেই উনি শান্ত ও ধৈর্য্যশীল ছিলেন। সুতরাং জেল-জীবনে না কখনো ঘাবড়ে গেছিলেন না কোন ঝামেলা করেছিলেন। তিনি কখনো নিজেকে হারিয়ে ফেলেননি। সব সময় হাসিখুশী থাকতেই তিনি পছন্দ করতেন।

অন্যান্য কার্যকর্তা যারা ডাক্তারজীর সাথে ছিলেন তাঁদের তিনি সব সময় সবপ্রকারের সাহায্য করতেন। একজন খুব রাগী ছিলেন। অন্য একজন বার বার নিরাশ হয়ে পড়তেন। ডাক্তারজী সব সময় তাঁদেরকে ধৈর্য্যের কথা বলতেন ও ভাল ভাল কথায় মাতিয়ে রাখতেন। একজন মুসলমান কার্যকর্তাও সেখানে ছিল। হিন্দুদের গোবধ নিয়ে আলোচনার সময় কিছু কিছু আপত্তিকর কথা বলেছিলো। সেই সময় একজন তরুণের রক্ত টগবগ করে উঠে এবং সে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও মারপিট শুরু করে। ঝট্ করে ডাক্তারজী ওদের দুজনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে যান। দুজনকে ধরে শান্ত করেন এবং বোঝান।

এ ধরনের ছোট ছোট ঝামেলা নিত্য প্রতিদিন ঘটে থাকত। ডাক্তারজী সেগুলো মিটিয়ে ফেলতেন। বিভিন্ন বয়স, বিভিন্ন মতের ও বিভিন্ন জাতের লোক ওখানে ছিল। ডাক্তারজী সকলকে সামলাতেন। কারো পিটে চাপড় দিতেন, কারো সাথে আলোচনা করতেন। কাউকে খাইয়ে দিতেন আবার কারো পাও টিপে দিতেন। ডাক্তারজীর প্রভাব এমনই ছিল যে ঝামেলা পাকাতে পারে এমন লোকেরাও ডাক্তারজীকে দেখে মাথা নত করে থাকত। জেলের অধিকারীও ডাক্তারজীকে খুব সম্মান করতেন। ডাক্তারজীর চোখে ছিল তেজ। বাণীতে ছিল ভালবাসা ও সাথে ছিল বাহুতে বল। এই কারণে সকলে তাঁর বশে থাকত।

সদাসর্বদা প্রসন্ন চিত্তে থাকতেন। নানাধরনের গল্প ও কবিতা তিনি জানতেন। বলার ভঙ্গীটা খুবই আকর্ষক ছিল। তাই তিনি যেখানে যেতেন বা বসতেন সর্বদা হাসির পরিবেশ বিরাজ করত।

জেল থেকে ছাড়া পাবার সময় কেউ কেউ একটু দুর্বল হয়ে গেছিল। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। ১২ জুলাই ১৯২২ সালে ডাক্তারজী জেল থেকে যখন ছাড়া পেলেন তখন তাঁর পুরানো জামাগুলো খুবই ছোট হয়ে গেছিল।

কেউ একজন বললো, "ডাক্তারজী, মনে হচ্ছে আপনি একটু মোটা হয়ে গেছেন। দেখিতো আপনার ওজন এখন কত?"

ডাক্তারজী ওজন করে দেখলেন তাঁর ওজন আগের চেয়ে ২৫ পাউণ্ড বেড়ে গেছে।

অপর একজন ভদ্রলোক বললেন, "সত্যিতো এটা আশ্চর্যেরই কথা। কি করে এটা হল?"

ডাক্তারজী উত্তর দিলেন—"হিন্দুধর্মের নিয়মানুসারে আমার পেটে যথেষ্ট হজম করার ক্ষমতা আছে। কিন্তু হজমশক্তি একটু দুর্বল হয়ে গেছিল, ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। তা সত্ত্বেও আমার ওজন বেড়ে গেছে।"

জেল জীবনের নানা ঘটনা ডাক্তারজী বেশ রসিয়ে রসিয়ে তাঁর বন্ধু বান্ধবকে শুনাতেন।

— ❖ —

বিচার মন্থন

জেলে থাকাকালীন ডাক্তারজী দেশের নানা সমস্যা নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করেন। ছোট বড় সব কার্যকর্তাদের সাথে এনিয়ে আলোচনা করতেন। রাত্রিতে জেলকামরা বন্ধ হত। সকলে ক্লান্ত হয়ে থাকত ও মানসিক দুঃখে ভারাক্রান্ত থাকার জন্য একটুতেই ঘুমিয়ে পড়ত। কিন্তু ডাক্তারজী বিছানায় শুয়ে পড়ার সাথে সাথে ভারতের পুরো ইতিহাস চোখের সামনে ভেসে উঠতো। ঘুমোতে পারতেন না। সারাদিনে কে কি বললো? কার কী মত? কার কথায় কতটুকু যথার্থতা আছে? দেশের মুক্তির জন্য কোন পথ বেছে নিতে হবে? কোনটা পরিত্যাগ করতে হবে? ইত্যাদি নানা প্রশ্নের সমাধান নিজে নিজেই করে ফেলতেন। কখনো কখনো দেশের চিন্তায় এমন মগ্ন হয়ে পড়তেন যে সারারাত জেগেই কাটিয়ে দিতেন। ভাবনাচিন্তার ঝড় এসে পড়ত।

".....আমাদের দেশের পরিস্থিতি কত জটিল। চারিদিকে দুঃখ আর কান্না। এই পরিস্থিতির প্রকৃত কারণ কি? দেশ আমাদের বিরাট। দেশের লোকতো বুদ্ধিমান ও পরাক্রমী। ধর্ম আমাদের শ্রেষ্ঠ। ইতিহাস আমাদের প্রাচীন ও গৌরবশালী। তথাপি কেন আমরা পরাধীন হলাম? হাজার বছর ধরে আমরা পরাধীন কেন? খাইবার ও বোলান হয়ে আফগান, পাঠান ও মোগলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনাপতিরা আমাদের দেশ আক্রমণ করে। ইংরেজরা তো ব্যবসা করার জন্য এখানে এসেছিল।

"দেশের জনসংখ্যাতো বিরাট। আমাদের দেশে রাজা ছিল, ছিল তাদের সেনাপতি, সাথে ছিল সৈন্য সমূহ। সৈনিকেরা ছিল সাহসী। তাদের কাছে নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ছিল। তথাপি আমরা হেরে গেলাম কেন? কেন পরাধীন হলাম? উত্তর থেকে আসা আক্রমণকারীরা কি আমাদের এই অবস্থা করে দিল? না, ইংরেজদের জন্যই আমরা সবকিছু হারিয়ে ফেললাম? না, কখনোই তা হতে পারে না। আমাদের দুর্গতির মূলে রয়েছি আমরা। আমাদের অলসতাই আমাদেরকে পরাধীন করেছে। আমাদের ব্যক্তিগত কলহ পরাধীনতার একমাত্র কারণ। ছোট ছোট ভাগে আমরা বিভক্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের দেশকে আমরা টুকরো টুকরো করেছি। সম্পূর্ণ দেশের কথা আমরা কখনো ভাবিনি। আমাদের মন সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। প্রতিবেশীর ঘরে আগুন লেগেছে তো

আমার কি? পুড়ে যাক, আমার তাতে কি যায় আসে? পাশের গ্রামে ডাকাত পড়েছে জিনিষপত্র হয়ত লুট করছে, আমার বাড়ী, আমার পয়সা, আমার জমি, আমার পরিবার, আমার রাজ্য, এই চিন্তাতে আমরা মগ্ন। আমার দেশ, আমার ধর্ম, আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি, আমাদের সম্পূর্ণ সমাজ.... এই সমস্ত উদার চিন্তা করা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে আমরা পরাধীন হলাম। আমি ও আমার দেশের মধ্যে যে একটা সম্পর্ক আছে—তা দৈনন্দিন কাজে প্রকাশ হতে দেখা যায় না। আমার খাওয়া পরা, ওঠা বসা, কথা বলা, কাজকর্ম করা সবই সমাজের দয়ায় হচ্ছে। আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। উপযুক্ত প্রতিদান দেওয়া দরকার। একথা আমরা একেবারেই ভুলে গেছি। যার জন্যই আমরা আজ পরাধীন। এদেশে অনেক প্রদেশ, অনেক ভাষা। নানা পূজা পদ্ধতি, নানা জাতি উপজাতি, নানা বেশভূষা, নানা ধরনের খাওয়া দাওয়া তবুও আমরা এক, আমাদের রক্তও এক, একথা আমরা ভুলে গেছি। যার জন্য আজ আমরা বিদেশীদের দাস।

" আমাদের রাষ্ট্র এক সমাজ-পুরুষ। তাঁর কোটি হাত, কোটি পা। কোটি মস্তক। এদেশ পরমেশ্বরের প্রতীক স্বরূপ। একথা ভোলার কারণেই আমরা পরমুখাপেক্ষী। আমাদের ব্যবহার থেকে অনুশাসন, রীতি নীতি, আইন কানুন, স্নেহ ভালবাসা সবই শেষ হয়ে গেছে, তাই আমরা পরের চরণ পূজাতে ব্যস্ত। আমরা ভুলে গেছি ভারত আমাদের মা, আমরা সকলে ভাই। গরীব হোক বা বড়লোক, কৃষক বা মজদুর, শহরের লোক বা গ্রামের, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, চামার, লোহার, স্বর্ণকার, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, যে কোন জাতের, যে কোন ব্যবসায়ের লোক হোক না কেন—সকলে আমরা ভাই। এটাই আমরা ভুলে গেছি, যার জন্য এই দুর্দশা।

"এই দুর্দশা দুর করার জন্য প্রথমেই আমাদের ভিতরের দুর্গুণগুলোকে দূর করতে হবে। ..... এ কাজ ভাষণের দ্বারা, লেখার দ্বারা বা আন্দোলনের দ্বারা সম্ভব নয়। কেবল ইংরেজ বা মুসলমানদেরকে দোষী করা বা গালাগালি দিলে কিছুই হবে না। এর জন্য দরকার সামাজিক বোধ জাগান ও সাথে অনুশাসন নির্মাণ করা। বন্ধুত্বের পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। নূতন নূতন যুবকদেরকে একত্রিত করতে হবে। এর গুরুত্ব ওদেরকে বোঝাতে হবে। নিয়ম পালনে ইচ্ছুক, ছোটবড় কাজে দক্ষ, ত্যাগী ও সেবা-মনোভাবাপন্ন যুবকদেরকে কাছে আনতে হবে। দেশ ও দশের জন্য ঘরবাড়ী ছেড়ে নিজের সুখকে পদদলিত করে দেশসেবায় আত্মনিয়োগে সক্ষম এমন কার্যকর্তা নির্মাণ করতে হবে। এ সব কাজ করবে কে? আমি করবো। আমি প্রথম আরম্ভ করবো। আমি প্রকৃত মায়ের সেবক হবো। এক দীপ থেকে অন্য দীপ জ্বালান যায়। ঐ ভাবে এক থেকে একশ হবে। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, প্রদেশে প্রদেশে সারা দেশে যখন দেশের জন্য অহর্নিশি চিন্তা করবার মতো দেশপ্রেমিক তৈরী হবে তখনই দেশে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব। তখনই আমাদের সম্পূর্ণ দেশ নব আশায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। তখনই আমাদের দেশ সুখী হবে, সমৃদ্ধ হবে ও বৈভবশালী হবে...এবং এটা তখনই সম্ভব যখন সর্বত্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেশসেবক দেখা যাবে..... কি করে তা সম্ভব হবে সেই দিকেই আমাকে খেয়াল দিতে হবে।"

জেলখানায় যখন ডাক্তারজী একা থাকতেন তখন এধরনের চিন্তায় তিনি ডুবে থাকতেন। অন্তঃকরণে সদাসর্বদা এই ভাবনা ভেসে বেড়াত। মন্থন করে মাখন বার হয়ে থাকে। এহেন মনোভাবকে মন্থন করে তার ভিতর থেকে যা বার হয়ে এল তারই নাম রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ।

— ❖ —

সংঘ প্রতিষ্ঠা

জেল থেকে মুক্ত হবার সাথে সাথে ডাক্তারজী সব কাজ পূর্বের ন্যায় শুরু করে দিলেন। এসব কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে সচ্চরিত্র যুবকের অনুসন্ধান তিনি করে চললেন। তাদের সাথে সম্পর্ক বাড়াতে থাকলেন। কোন না কোন অজুহাতে সকলকে একত্রিত করতে লাগলেন। ১৯২৫ সাল, দিনটি ছিল "শুভ বিজয়াদশমী"। সেইদিন তিনি শুরু করলেন "রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ।" নাগপুরের মহালে সর্দার মোহিতের একটি বাড়ী ছিল। কোন এক সময় বাড়িটি ছিল বিরাট কিন্তু এখন তা ভাঙ্গাচোরা অবস্থায়। সেখানে কেউ থাকতো না। সেখানেই সকলে মিলিত হতে লাগল।

আরম্ভে সপ্তাহে একদিন সকলে আসতে লাগল। কিন্তু পরে রোজ আসার নিয়ম চালু হল। আলোচনা বাক-বিতণ্ডা, প্রশ্নোত্তর সব চলতে লাগল। ডাক্তারজী নূতন নূতন বিষয় সকলের সামনে তুলে ধরতেন ও কার কি মত তা জানার চেষ্টা করতেন। নিজে কম কথা বলতেন। কিন্তু যেটুকু বলতেন সকলের মনে তার ছাপ পড়ত। ডাক্তারজীর কথা উচিত বলে সবাই মনে করত।

একদিন এক যুবক বললো, "আমরা রোজ একত্রিত হচ্ছি আর কথা বলছি। কিছু কার্য্যক্রম হলে বোধ হয় ভাল হয়।"

তাহলে কি কার্য্যক্রম নেওয়া যায়? কিভাবে নেওয়া যায়? ইত্যাদি বিষয় নিয়ে মত বিনিময় শুরু হল। ডাক্তারজী ধীরে ধীরে এই সমস্ত ভাবনাকে উপযুক্ত পথে চালনা করলেন। খেলা, ব্যায়াম, লাঠি, তলওয়ার চালান প্রভৃতি বিভিন্ন কার্য্যক্রম ঠিক করা হল।

পরের দিন নির্ধারিত সময়ে যুবকেরা যখন সেই স্থানে এলো তখন দেখা গেল খেলার মাঠটি যেন তাদেরকে আহ্বান করছে। চারিদিকে ঝাঁট দেওয়া হয়েছে। কোথাও অপরিষ্কার নেই। কাঁকড় বা পাথর কিছুই মাঠে পড়ে নেই। চারিদিকে জল ছিটান হয়েছে। কবাডি ইত্যাদি খেলার জন্য মাঠে ঘর কাটা হয়ে গেছে।

একে অপরকে জিজ্ঞাসা করা শুরু হয়ে গেল। "কে এখানে আগে এসেছ ভাই? এ সমস্ত কে ঠিক করেছে?" সবাই বলতে লাগল, "না ভাই, আমি ঠিক জানি না, আমি তো এখুনি এলাম।" ডাক্তারজী চুপ করে ছিলেন। জানা গেল ডাক্তারজী সর্বপ্রথম এখানে এসেছেন এবং তিনি সব করেছেন। ডাক্তারজীর শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি ঠিক এই রকমই। নিজে কাজ করো। কথার চেয়ে কাজ বেশী।

না বলতেই পরের দিন দেখা গেল কয়েকজন যুবক নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সংঘ স্থানে উপস্থিত। কেউ ঝাঁট দিল, কেউ জল আনলো, আবার কেউ জল ছিটালো। যথাসময়ে বাঁশী বেজে উঠলো। কার্য্যক্রম শুরু হল।

ওখানে খেলায় এত আনন্দ পেত যে সকলে খেলায় মশগুল হয়ে যেত। প্রথম দিন ৮/১০ ছিল, পরে তারা ২০ হল, তারপর ৫০শে দাঁড়াল। বাড়তে বাড়তে শ'খানেক যুবক নিয়মিত আসা শুরু করলো। না কেউ দেরিতে আসত, না কেউ অনুপস্থিত থাকত। সব কার্য্যক্রমে সকলেই অংশ নিত।

আবার সেখানে সমতা শিক্ষা দেওয়া শুরু হল। সকলে নিজ নিজ গণবেশ নিজেদের খরচায় তৈরী করলো।

— ❖ —

নিয়ম পালনের নির্দেশ

একদিন ডাক্তারজী চারজন স্বয়ংসেবক বন্ধুর সাথে আড়েগাঁও গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর এক বন্ধু থাকতেন। তাঁর ওখানে তাঁর ছেলের একটি 'মানত' ছিল। শনিবার ছিল সেই 'মানতের' দিন। ভোজনাদি করতে বেশ দেরী হয়ে গেল। নাগপুর যাবার যে শেষ বাস ছিল তাও চলে গেছে।

প্রতি রবিবার নাগপুরে সমস্ত স্বয়ংসেবকদের মিলিত শাখা হত এবং সমতার কার্য্যক্রম নেওয়া হত। সেই কার্য্যক্রমে সকলকে উপস্থিত থাকতেই হবে এ নির্দেশ ছিল। আড়েগাঁওয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেল। নাগপুরে যাবার মত কোন গাড়ী নেই। ডাক্তারজী পায়ে চলা শুরু করলেন। সাথে চার স্বয়ংসেবকও বর্তমান।

একজন বললো, "এখানে থেকে নাগপুরের দূরত্ব কিন্তু কম নয়। পুরা বিশ মাইল।"

ডাক্তার হেডগেওয়ার বললেন, "সারারাত ধরে আমরা চলবো এবং সকালে নির্ধারিত সময়ে সংঘস্থানে আমরা উপস্থিত থাকবোই।"

বন্ধু ও আত্মীয়েরা আপত্তি করলেন কিন্তু ডাক্তারজী কারো কথায় কান দিলেন না। পায়ে হাঁটা শুরু করলেন। দরদ দিয়ে কোন কাজে হাত দিলে ভগবানও তার সহায় হন। ৮/১০ মাইল চলার পর দেখা গেল নাগপুরগামী বাসখানা ডাক্তারজীর পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ড্রাইভার সাহেব ডাক্তারজীকে চিনতেন তাই বাসখানাকে দাঁড় করিয়ে বললেন, "ডাক্তার সাহেব এত রাতে পায়ে হেঁটে কোথায় যাচ্ছেন?"

হেসে ডাক্তারজী বললেন, "ভাই নাগপুরে যাওয়া জরুরী ছিল। অন্য কোন উপায় ছিল না, তাই কি করব?"

"তাহলে আসুন বসুন," ড্রাইভার সাহেব তাঁকে পাশে বসালেন ও বাকি স্বয়ংসেবকদেরকে পিছনে। রাত এক বা দেড়টা নাগাদ তাঁরা নাগপুরে পৌঁছে গেলেন। সকালে যথাসময়ে সংঘস্থানে তাঁরা উপস্থিত হলেন।

— ❖ —

আমি একলা

ডাক্তারজী এখন ২৪ ঘন্টাই সংঘ কার্য্যে মগ্ন থাকেন। চারিদিকে যেসব ঘটনা ঘটত সেগুলো তিনি মন দিয়ে বুঝতেন এবং তার সঠিক অর্থ বোঝাবার চেষ্টা করতেন। বিভিন্ন সামাজিক তথা রাজনৈতিক কাজেও তিনি পথ প্রদর্শন করতেন এবং প্রয়োজনে পরোক্ষ সাহায্য করতেন।

একবার ডাক্তারজী সংঘের কাজে বাইরে গেছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে নাগপুরে একটা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সভা। বক্তারাও ছিলেন বাঘা বাঘা। সভাতে হাজার লোক জমায়েত হয়েছিল। প্রথম বক্তার বক্তৃতা সমাপ্ত হলে দ্বিতীয় জন শুরু করলেন।

কিছু বদমাস লোক সভাটাকে ভেঙ্গে দেবার জন্য সেখানে উপস্থিত হয়। তারা মাঝে বসেছিল। তাদের মধ্যে একজন সভার মাঝখানে একটা ব্যাঙ্ ছুঁড়ে ফেলল।

কেউ কেউ বলে উঠলো—"সাপ সাপ"। তখন ৫/১০ জন সাপ সাপ বলে পালাতে শুরু করলো। সঠিক কি হয়েছে তা না জেনেই সকলে পালাতে শুরু করলো। একজনকে দেখে অন্যজনও পালাতে লাগল। অনেকে পড়ে গেল। অনেকে পায়ের তলায় চাপা পড়ল। কেউ হারালো ছড়ি, কেউ হারালো জুতা আবার কেউ হারালো মাথার টুপি, কারো কারো জামাও ওখানে পড়ে থাকতে দেখা গেল। এমন দৌড়ঝাঁপ শুরু হলো যেন সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত। হাজার লোকের সভা পনের মিনিটে খতম হয়ে গেল।

তিনদিন পর ডাক্তারজী যখন নাগপুরে ফিরে এলেন তখন সভার খবর সব জানতে পারলেন। শুনে খুব দুঃখ পেলেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন এমন অনেক ভদ্রলোকদের বাড়ীতে গিয়ে তাঁদের সাথে ডাক্তারজী দেখা করেন। তখনকার বার্তালাপ নিম্ন প্রকারের হল ঃ—

ডাক্তারজী—"ঐ দিনের সভায় আপনি তো উপস্থিত ছিলেন?

ভদ্রলোক—"হাঁ, আমি তো পরিচালকদের মধ্যে একজন।"

ডাক্তারজী—"তাহলে সভা ভেঙ্গে গেল কি করে?"

ভদ্রলোক—"কি আর বলবো, কয়েকজন গুণ্ডার পূর্ব নিয়োজিত কাজ। আমি তো ভাবছিলাম ওদেরকে একটা দি, কিন্তু আমি একলা কি করতে পারি? ডাক্তারজী অনেক পরিচিত ব্যক্তিদের সাথেও দেখা করেন। অনেককেই তিনি এ কথা জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরের সারাংশ ছিল, " আমার খুবই ইচ্ছা ছিল কিন্তু কি করবো, আমি যে একলা ছিলাম।"

ডাক্তারজী এই সভার হাল বুঝলেন ও সর্বশেষে বললেন, "আমি একা, এটাই হচ্ছে হিন্দু সমাজের প্রধান রোগ।" ওটাকে শেষ করতে হবে। যে কোন ভাল কাজে না ডাকলেও সেখানে যাওয়া দরকার। খারাপ লোকের সংখ্যা থাকে খুবই কম। "চোরে চোরে মাসতুতো ভাই" এর মত ঝট্ করে একত্রিত হয়ে যায়। আর যারা ভদ্রলোক,

তারা দূরে দূরেই থাকে। ভাল কাজ করতেও তারা ভয় পায়। উপরন্তু বলে "আমি একলা কি করব?" এই পরিস্থিতিকে বদলাতে হবে। প্রত্যেকটা হিন্দুর যেন মনে হয় যে আমি একা নই, পুরো সমাজ আমার পিছনে আছে। এই বিশাল হিন্দুরাষ্ট্রের আমি একজন। তাহলে পুরো হিন্দুরাষ্ট্রের বল আমাতে দেখা দেবে। এ কাজটা অত্যন্ত শুভকাজ, পরমেশ্বর আমার সহায়। প্রতিটি হিন্দুর মধ্যে এই ভাবটা যদি জাগাতে পারা যায় তবেই আমাদের দেশ দুনিয়াতে অগ্রগণ্য বলে প্রমাণিত হবে। সংঘকে এই কাজটাই করতে হবে।

এ ধরনের মার্গদর্শন ডাক্তারজী স্বয়ংসেবকদের নিত্য প্রতিদিন করতেন। প্রত্যেকটি স্বয়ংসেবকের শারীরিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটুক, ও একজন ভাল নাগরিক হোক এটাই ডাক্তারজীর রাত দিনের চিন্তা ছিল। এরই ফলস্বরূপ নাগপুরে খুব শীঘ্রই কয়েকটা শাখা শুরু হল।

— ❖ —

একটি আপত্তি

সংঘের কাজ ধীরে ধীরে বেড়ে চলল। সংকটের ছায়াও কিন্তু উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগল। ডাক্তারজীর কথায় শতশত যুবক উঠছে বসছে ও তাঁর কথা শুনে কাজ করছে, এসব দেখে অনেক নেতারই মনে হিংসার উদ্রেক হতে লাগলো। যারা ব্যায়ামাগার চালাত তারাও মনে করতে লাগলো যে আগামী দিনে সব যুবকদের এই সংঘ আকর্ষিত করে নেবে, সুতরাং তারাও সংঘকে শত্রু বলে ভাবতে লাগল।

কিছু কিছু লোক নিজেদের উগ্র হিন্দুত্ববাদী বলতো। ওরা মনে করতো যে তারা মহান্, মনীষী ও নেতা। অতএব সংঘ আমাদের কথামত চলুক। আমাদের সভা ইত্যাদির ব্যবস্থা সংঘের স্বয়ংসেবকদেরই করা দরকার। আমাদের আদেশ মত চলা উচিত। কিন্তু সংঘের কার্যকর্তারা তাদেরকে বোঝালেন যে সংঘ কোন ব্যক্তি বা দলের নির্দেশে চলবে না। সব দলই সংঘের কাছে সমান, তখন থেকে তারা সংঘের সমালোচনা শুরু করে দিল, সাথে বিরোধিতাও।

কিছু মুসলমান মনে করতে লাগলো যে আমাদেরকে মারবার জন্যই এরা লাঠি চালান শিখছে অতএব এরা আমাদের দুশমন। কিছু কিছু কংগ্রেস কার্যকর্তার মুলসমানদের প্রতি অহেতুক আকর্ষণ ছিল। তাঁরা মনে করতেন মুসলমানদের সাহায্য ছাড়া দেশের উন্নতি হতে পারে না। সংঘতো কেবল হিন্দু সংগঠনের কথা বলে সুতরাং মুসলমানদের উচিত এদের বিরোধিতা করা, এই মনোভাব নিয়ে কংগ্রেসীরা সংঘের বিরোধিতা শুরু করে দিল। ইংরেজরা মনে করত সংঘতো প্রকৃত রাষ্ট্রীয়তার কাজে হাত দিয়েছে অতএব এহেন রাষ্ট্রীয়তার জাগরণ না হওয়াই শ্রেয়—এটাই ছিল ওদের লক্ষ্য। তাই সংঘকে ওরা চরম শত্রু বলে মনে করতে লাগল।

ইংরেজ গুপ্তচরেরা ডাক্তারজীর সম্বন্ধে সবই জানতো কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনার মত প্রমাণ তারা সংগ্রহ করতে পারেনি। তারা চাচ্ছিল এমন কিছু একটা কারণ ঘটুক যার দ্বারা ডাক্তারজীকে ধরা সম্ভব হয় এবং জেলে পাঠান যায়। তখন না থাকবে বাঁশ, না বাজবে বাঁশী। সংঘ নিজে নিজেই তখন খতম হয়ে যাবে।

এইভাবে চারিদিকে বিপদ ঘনিয়ে আসতে লাগল কিন্তু ডাক্তারজী একটুও দমলেন না। কখনো চালাকি দ্বারা, কখনো নীরবতার মাধ্যমে আবার কখন আক্রমণের মাধ্যমে সংঘকে শত্রুদের হাত থেকে বাঁচিয়ে চললেন। কোন কিছুরই আঁচ যাতে সংঘের উপর না লাগে তার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

ভারতের স্থায়ী উন্নতির জন্য অস্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমে বিপ্লবের অযৌক্তিতার বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পর আগের বিপ্লবী জীবনের সবকিছু সম্পর্ক তিনি ছিন্ন করেন। কিন্তু একবার এক ঝামেলা দেখা দিয়েছিল। কুশলতার মাধ্যমে তা থেকে তিনি মুক্তি পান। এক-আধবার রান্নাঘরের আগুন নেবানোর পর সামান্য আগুন থেকে আবার আগুন জ্বলে ওঠে ও আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত কোন ব্যবস্থাপক ওখানে সেই সময় উপস্থিত হয় ও বিপদ দূর করে। ঠিক ঐ কথাই এখানে প্রযোজ্য।

গঙ্গাপ্রসাদ নামে ডাক্তারজীর এক বিপ্লবী বন্ধু ছিলেন। তিনি সাধু হয়ে একটা নির্জন মন্দিরে থাকতেন। অসুস্থ হয়ে পড়লে গঙ্গাপ্রসাদ ওয়ার্ধার নিকটে দু মাইল দূরে অবস্থিত এক গ্রামে তাঁর ভাই যেখানে থাকতো সেখানে গিয়ে উঠলেন। বেআইনীভাবে পিস্তল ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র উনি নিজের কাছেই রেখেছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদের অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে তার এক চেলা, ৫/৬ জন লোককে একত্রিত করে সেই অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে একটা ষ্টেশন লুটবার চেষ্টা করে।

ডাক্তারজী তা জানতে পারলেন। সাথে সাথে এর পরিণাম কি হতে পারে তা তিনি অনুমান করলেন। তিনি নাগপুর হতে বেরিয়ে পড়লেন এবং ওয়ার্ধাতে আপ্পাজী যোশী নামক এক বন্ধুর কাছে এসে উঠলেন। আপ্পাজীকে বললেন, "আমাদের এখুনি গঙ্গাপ্রসাদের কুটিরে যেতে হবে। পুরাতন কিছু অস্ত্রশস্ত্র ওখানে পড়ে আছে। ওগুলোর অপব্যবহার হচ্ছে। যদি পুলিশের হাতে পড়ে যায় তবে একটা বড়রকমের ঝামেলা দেখা দিতে পারে।"

আপ্পাজী বললেন—"আপনি নিশ্চয় জানেন যে আমাদের উপর গুপ্তচরদের নজর আছে। আর গঙ্গাপ্রসাদের কুটিরের আশে পাশে পুলিশ অধিকারীরা তাক করে হয়তো বসে আছে। অতএব ওখানে আমাদের না যাওয়াই শুভ।"

ডাক্তারজী বললেন—"ঠিকই বলেছেন, কিন্তু এই সময় আমরা যদি না যাই তাহলে আমাদেরও কোন না কোন বিপদ দেখা দিতে পারে। অতএব শীঘ্রই চলুন।"

আপ্পাজী যোশী ডাক্তারজীর পিছু পিছু চললেন। সময়টা মধ্যরাত্রি, চারিদিকে ঘন অন্ধকার। কোনরকম ভয় না করে দুজনে গঙ্গাপ্রসাদের কুটিরে গিয়ে পৌঁছালেন। ডাক্তারজী গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকলেন। আপ্পাজী শয্যাশায়ী গঙ্গাপ্রসাদের সামনে

উপস্থিত হয়ে ডাক্তারজীর আগমনের কথা বললেন। গঙ্গাপ্রসাদ উঠে বাহিরে এলেন ও যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র তাঁর কাছে ছিল সব ডাক্তারজীকে দিয়ে দিলেন।

ডাক্তারজী যাবার জন্য তৈরী হচ্ছেন এমন সময় দুজন লোক ডাক্তারজীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ডাক্তারজী একটু পিছু হটলেন। অস্ত্রশস্ত্রগুলো আপ্পাজীকে দিলেন। আপ্পাজী সাথে সাথে সেখান থেকে সরে গিয়ে অন্ধকারে লুকিয়ে পড়লেন। তখন ডাক্তারজীর সাথে ঐ দুই ব্যক্তির মারপিট হলো। ডাক্তারজী এমনভাবে দুজনকে পেটালেন যে ওদের পক্ষে ওখান থেকে ওঠা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। দুজনের উঃ আঃ শুনবার পর ডাক্তারজী সেখান থেকে সরে পড়লেন ও অন্ধকারে গা ঢাকা দিলেন।

পরের দিন ডাক্তারজী নাগপুরে ফিরে এলেন এবং শান্তচিত্তে তাঁর নিত্যকাজ করে চললেন। ডাক্তারজীর সাবধানতা ও সাহসের দরুন বিপদটা কেটে গেল। তা না হলে, না জানি কি হত? ডাক্তারজী সর্বদা সতর্ক থাকতেন। ইংরেজ অধিকারীরা ও ছোটবড় সংস্থা সংঘের উপর আঘাত হানার জন্য তৈরী ছিল। কিন্তু ডাক্তারজী কখনো শক্তির প্রয়োগের দ্বারা, কখনো যুক্তির দ্বারা সংঘকে বাঁচিয়ে রাখলেন ও বাড়িয়ে চললেন। নিজেদের সব কাজ খোলাখুলি করতেন। কখনো গোপনতার আশ্রয় তিনি নিতেন না। ওঁর ঘরের দরজা সদাসর্বদা খোলাই থাকতো।

— ❖ —

জঙ্গল সত্যাগ্রহ

১২ মার্চ ১৯৩০ সাল। লবণ সত্যাগ্রহের জন্য মহাত্মা গান্ধী আমেদাবাদ থেকে রওনা হন। এপ্রিলের ৫ তারিখে তিনি দাণ্ডীতে পৌঁছান। সরকারী আইন ভেঙ্গে তিনি সেখান থেকে লবণ তুললেন। এই আইন ভাঙ্গার জন্য আন্দোলন শুরু করলেন। সারা দেশে তার ঢেউ দেখা দিল। যেখানে লবণ আইন ভাঙ্গার জন্য সমুদ্র ছিল না, সেখানে অন্যান্য আইন ভাঙ্গা শুরু হল। মধ্যপ্রদেশে বাপুজী আণে জঙ্গল সত্যাগ্রহ আরম্ভ করলেন। ডাক্তারজী তাতে যোগ দিলেন।

সত্যাগ্রহে যাবার পূর্বে ডাক্তারজী সকল স্বয়ংসেবকদের একত্রিত করলেন। এ সত্যাগ্রহ কেন ও আমি কেন এতে অংশ নিচ্ছি? দেশের পরিস্থিতি কেমন? পরিবর্তন কি করে করা যায়? বিভিন্ন বিষয় স্বয়ংসেবকদের সামনে তুলে ধরলেন। যোজনা অনুসারে ১৪ জুলাই ১৯৩০ সালে ডাক্তারজী নিজের দলের সাথে নাগপুর ছাড়লেন। তাঁদের বিদায় দেবার জন্য শতশত নাগরিক নাগপুর ষ্টেশনে উপস্থিত হয়। গাড়ী ছাড়ামাত্র "ভারতমাতাকী জয়" ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কেঁপে ওঠে।

প্রত্যেকটি ষ্টেশনে ডাক্তারজীর সাথে সাক্ষাতের জন্য লোক আসতে থাকে। তাঁকে অভ্যর্থনা জানান হয়। সংঘের অনেক স্বয়ংসেবকও ডাক্তারজীর সাথে দেখা করতে

আসে। মুর্তিজাপুরে (মর্তিজাপুর) ষ্টেশনে কিছু স্বয়ংসেবক ডাক্তারজীর সাথে দেখা করতে এলে ডাক্তারজী তাদের বলেন—"চলো আমাদের সাথে, ঘরে বসে কি হবে?" ওরা সাথে সাথে টিকিট কাটল ও গাড়ীতে উঠে বসল। "বাড়ীর কি হবে, পরে আসছি, সব ব্যবস্থা করে আসছি" ইত্যাদি কথা কেউ মুখ থেকে বেরই করেনি। ডাক্তারজী বললেন চলো, সাথে সাথে তারা রওনা দিয়ে দিল।

২২শে জুলাই ১৯৩০ সাল। ইয়ৎমালের নিকটস্থ জঙ্গলে নিজের দলকে নিয়ে ডাক্তারজী সত্যাগ্রহ আরম্ভ করলেন। নয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড তাঁকে দেওয়া হল। পরের দিন ডাক্তারজীকে আকোলা জেলে পাঠান হল। কথা আছে "সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে।" মহাপুরুষের সম্পর্কে এসে সাধারণ ব্যক্তিও মহান্ হয়ে যায়। ডাক্তারজীর মধ্যে সে ধরনের কোন শক্তি বিরাজ করত। ডাক্তারজী আকোলা জেলের পরিবেশ একেবারে পালটিয়ে দিলেন। তাঁর মধুর ব্যবহার ও মিষ্টি কথায় জেলের ছোট বড় সকলে তাঁর বন্ধু হয়ে গেল। বিদর্ভের অনেক স্থান থেকে সংঘের স্বয়ংসেবকরাও সেখানে এসেছিল। ডাক্তারজী সেখানে আছেন দেখে সকলে খুবই আনন্দিত হল। আকোলার ডাক্তার ঠোসর, মেহকরের দাদাসাহেব সোমন, ওয়ার্ধার আপ্পাজী যোশী, ইয়ৎমালের সঃ হঃ বল্লাল, আকোটার দাজীসাহেব বেদরকর এধরনের সব রথী মহারথী আকোলা জেলে একত্রিত হন। তখন সেটাকে আর জেলখানা মনে হল না। মনে হল এটা সংঘের একটি সংঘ শিবির।

ডাক্তারজী সেখানে রোজ রোজ নূতন নূতন লোকের সাথে পরিচয় শুরু করে দেন। তাদের সাথে পরিচয় করা, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সংঘের ভাবধারা ওদেরকে বোঝাতে থাকতেন। সেখানে কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে সংঘের স্বয়ংসেবক করলেন। ডাক্তারজীর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে জানার সুযোগ অনেক স্বয়ংসেবক সেখানে পেয়ে গেল, 'দূরের বাজনা শুনতে ভাল' বড় বড় নেতাদের সম্বন্ধে এধরনের ধারণা অনেকের মধ্যেই ছিল। কিন্তু ডাক্তারজী ছিলেন ব্যতিক্রম। ওনার সাথে থাকার অর্থই হচ্ছে আনন্দ, প্রেরণা ও নবদিগন্তের পথ নির্দেশ প্রাপ্ত হওয়া। ডাক্তারজীর অন্তর ও বাহির ছিল নির্মল, নিষ্কণ্টক ও প্রেমময়।

১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩১ সালে ডাক্তারজী জেল থেকে মুক্তি পান। তারপরই তিনি নাগপুর ফিরে এলেন এবং পুরো শক্তি লাগিয়ে সংঘের কাজে লেগে পড়লেন। আস্তে আস্তে অন্যান্য কাজ হতে নিজেকে একেবারে সরিয়ে নিলেন।

— ❖ —

একটি স্বপ্ন

দিনরাত সংঘের কাজ করে চলেছেন ডাক্তার হেডগেওয়ার। সকাল সন্ধ্যা, দিনরাত, ঘরে বাহিরে শুধু সংঘ। স্বপ্ন দেখলে তিনি সংঘের স্বপ্নই কেবল দেখতেন।

একবার নাগপুরের কোন এক শাখায় স্বয়ংসেবকদের মধ্যে ঝগড়া দেখা দেয়। ফলস্বরূপ ছোট ছোট দুটি দল তৈরী হয়ে পড়ে। একটি দল শাখায় আসা বন্ধ করে দেয়। অপরটি ভাবল এটা আমাদের জয়। এসব শুনে ডাক্তারজী খুব দুঃখ পেলেন। দুই দলের সকলের সাথে ডাক্তারজী ব্যক্তিগতভাবে দেখা করলেন। প্রত্যেককে তিনি বোঝালেন। ওদের ঝগড়া দূর করলেন। সকলে আবার শাখায় আসা শুরু করল। শাখা ভালভাবে চলতে লাগল।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাগপুরের সব স্বয়ংসেবকদের এক সমাবেশ করে তাতে ডাক্তারজী বলেন, "স্বয়ংসেবক বন্ধুগণ, ইতিহাসের শিক্ষাগ্রহণ করা বুদ্ধিমানের লক্ষণ। ছোট অহংকারকে মনে স্থান দেওয়া, তাকে পালন করা, বাড়ান, ব্যক্তিগত আকাঙক্ষাকে বড় করে দেখা, ছোট ছোট দলে বিভক্ত হওয়া, সামান্য কথায় নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধান, এগুলোই আমাদের দেশের দুর্গতির মূল কারণ। এ সমস্ত দুর্গুণকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য আমরা সংঘ তৈরী করেছি। এর জন্য আমাদের ঠিক করা উচিত যে কোন কিছুর জন্যই আমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ বাঁধাবো না। মনে কর, মতভেদ দেখা দিল, কেউ হয়তো কারো কথা শুনলো না, আবার কেউ হয়তো কোন কাজ অন্যভাবে করে ফেললো। তার জন্য রাগ করে সঙ্ঘে না আসার কি যৌক্তিকতা থাকতে পারে? সংঘতো কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। সংঘ আমার নয়, সংঘতো সব লোকের। সংঘ সারা সমাজের। সংঘ এই ভারতের। কি করে একে আমি ছাড়তে পারি?

"গত সপ্তাহে নিজেদের মধ্যে ঝগড়ার কথা শুনে আমি খুব দুঃখ পেয়েছি। সারারাত সে নিয়ে চিন্তা করেছি। হঠাৎ ঝিমুনি আসতেই আমি এক স্বপ্ন দেখলাম। অতীতে আমি চলে গেছি। ছিলাম একটি দুর্গের মধ্যে। যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছি। হঠাৎ শত্রু আক্রমণ করে, কামান চালায়। কামানের গোলায় দুর্গের দেওয়াল ফুটো হয়ে গেছে। দেওয়ালের পাথর ভিতরে পড়ে গেছে। সকলে তাড়াতাড়ি এক জায়গায় এলাম। সারারাত ধরে চেষ্টা করে দেওয়ালের ফুটোটা বন্ধ করা হল। তখন আমাদের সেনাপতি বললো বহিরাক্রমণে আমাদের ভয় নেই। দুর্গের দেওয়াল ভিতরের দিকে ধ্বসে গেলে তাতে কোন ভাবনা নেই। দেওয়াল যাতে বাইরের দিকে না পড়তে পারে, ইঁট পাথর যেন বাইরে না পড়ে।

"এগুলো শুনামাত্রই আমার ঘুম গেল ভেঙ্গে। চোখ খুললাম। এই স্বপ্ন আমাদের এক উপদেশ দিয়ে পাঠিয়েছে। বাহির থেকে যতই কোন আক্রমণ হোক না কেন, তাতে সংঘের লাভ বৈ ক্ষতি হবে না। কিন্তু আমাদের স্বয়ংসেবক যেন সংঘ না ছাড়ে, দেওয়ালের ইঁট পাথর যেন বাইরের দিকে না চলে যায়।"

— ❖ —

প্রসন্নতার প্রতীক

রুক্ষতার প্রকাশ বড় বড় নেতাদের মধ্যে বেশীর ভাগ দেখা যায়। কারো কারো চোখে মুখে রুক্ষতার ছাপ পাওয়া যায়। কেউ কেউ অহংকারবশত অন্যকে তুচ্ছ বলে মনে করতে থাকে। কারো কারো সব সময় উপদেশ দিতেই ভাল লাগে। ডাক্তারজী কিন্তু এসব থেকে একেবারে ছিলেন মুক্ত।

তাঁর প্রত্যেকটি ব্যবহারে সৌজন্যশীলতার ও সৌম্যতার প্রকাশ ঘটে থাকত। মুখে সব সময় হাসি। সারা দেশে ঘুরে বেড়াতেন। ছোট বড় কার্যকর্তারা তাঁকে নিকট থেকে দেখার সৌভাগ্য পেয়েছিলেন। স্মরণশক্তিতে তিনি ছিলেন ভরপুর। অভিজ্ঞতার বিবরণ দেবার ভঙ্গী ছিল অদ্ভুত। একবার কারো সাথে পরিচয় ঘটলে তাকে কখনো ভুলতেন না। কথায় ছিল না কোন লোক দেখানোর ভাব। বুদ্ধি ছিল তীব্র। প্রত্যেকটি কথার অন্য অর্থ বার করে হাসি তামাসা করতে পারতেন।

একবার এক বিবাহ উপলক্ষে এক স্বয়ংসেবকের বাড়ীতে উপস্থিত হন। তাঁর ঘরে বেশ কিছু যুবকেরাও ছিল। সেখানে একনাগাড়ে বিভিন্ন বার্তালাপ চলতে থাকে এবং প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর সকলে হাসিতে ফেটে পড়তো। তা শুনে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলেন, "এসব ছেলেরা সব কি লাগিয়েছে? ওদেরকে একটু ডাঁটতে হবে। ডাক্তারজী ওখানে শুয়ে আছেন। তাঁর হয়তো খুবই কষ্ট হচ্ছে।" এইভাবে ঘরের মধ্যে গিয়ে যা দেখলেন তা অভাবনীয়। ডাক্তারজী নিজেই ঐ হাসি তামাসার কেন্দ্র। সকলে তাঁর পাশে বসে তাঁর কথা শুনে যাচ্ছে। ডাক্তারজী কোন একটি ভালো বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন এবং সকলের সাথে উনিও হাসিতে সামিল হচ্ছেন।

— ❖ —

কি ধরনের বিনম্রতা

সংঘকার্য্যের জন্য কোন প্রকারের মান অপমান তিনি গায়ে মাখতেন না। সারা দেশে উনি যেতেন। ছোটবড় সহরে গিয়ে কার্যকর্তাদের সাথে দেখাশুনা করতেন। সংঘের ভাবধারা সকলকে বোঝাতেন। ছোট ছোট নেতারাও নিজেদেরকে বড় মনে করে নিজেদের মত প্রকাশ করতো। স্বার্থসম্পন্ন কর্তব্যহীন হওয়া সত্ত্বেও ডাক্তারজীকে উল্টো পাল্টা নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করত ও উপদেশও দিতো। কেউ বলতো—"হিন্দুস্থান হিন্দুদের কি করে?" হিন্দু শব্দ বেদ বা পুরাণে তো নেই, সুতরাং ওর উপর এত জোর দেওয়ার প্রয়োজনই বা কী? আর হিন্দু সংগঠন? সে তো অসম্ভব ব্যাপার। দাদা, আপনি শুনে রাখুন, "খরগোসের শিঙ্ বার হলে বার হতেও পারে, কুকুরের লেজ হয়তো কখনো সোজাও হতে পারে। কিন্তু হিন্দুরা কখনো সংগঠিত হতে পারে না। এই কাজে শক্তি লাগানোর কোন মানেই হয় না।"

আবার কেউ বলেন— "বার্ষিক উৎসব কেন আপনি করেন না?" কেউ বলে—

"চাঁদা কেন তোলেন না?" অন্যজন বলেন—"সিদ্ধান্ত তো সঠিক, কিন্তু রোজ উপস্থিত কি বাস্তবসম্মত?" কেউ বলেন—লাঠি শেখানো বা তলওয়ার শেখানোর দরকার কি? কেউ সমতা শিক্ষার বিরোধ করতো, আবার এটা ক্ষতিকারক বলে মন্তব্যও করতো। কারো অভিযোগ, আপনি হিংসার প্রশ্রয় দিচ্ছেন, কারো মতে আপনি নপুংসক। কেউ মত দিচ্ছেন—এ লাঠি তলওয়ার বন্ধ করে বন্দুক পিস্তল শিক্ষা দেন তাহলেই আপনার সঙ্গে থাকবো। কেউ কেউ বলেন—"তোমাদের সংঘের বক্তৃতা আমরা শুনেছি কিন্তু তাতে না ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোন কথা থাকে, না মুসলমানদের বিরুদ্ধে?"

কেউ শ্লোগানের পক্ষে আবার কেউ মিছিলের পক্ষে। কেউ কেউ বলেন, স্বয়ংসেবকদের উচিত হাতে ঝাঁটা নিয়ে চারিদিক পরিষ্কার করা। আবার কারো মতে স্বয়ংসেবকদের চিকিৎসালয় খোলা, ঔষধ বিলি করা বা মৃতদেহ সৎকারে অংশ নেওয়া দরকার। আবার কারো কারো মতে সংঘের স্বয়ংসেবকদের উচিত নিজ নিজ বুদ্ধি ও ক্ষমতা অনুসারে আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধার্মিক এবং শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করা।

কেউ বলেন—"তোমাদের সংঘ তো কোন কাজের না। এরা নিষ্ক্রিয়, কখনো এর উন্নতি হতে পারে না।" কেউ গলা উঁচু করে বলতো, সংঘের কাজ ঠিক ভাবেই চলছে এবং এইভাবেই চলতে দিন। আবার ধীরে ধীরে নিজেদের বন্ধুকে বলতেন, সংঘের পরিকল্পনা তো আমারই পরিকল্পনা। মাঝে মাঝেই ডাক্তারজীকে তো আমি মার্গদর্শন করি। যেমন আমি বলি তেমনই তিনি কাজ করেন বলেই তো সংঘের সুনাম হচ্ছে।

ডাক্তারজী যখন বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লোকের সাথে দেখা করতেন তখন এ সমস্ত কথা শুনতে পেতেন। ধীর স্থির ভাবে শুনে যেতেন। ডাক্তারজীর সাথে যাঁরা যেতেন তাঁরা কিন্তু রেগে যেতেন। তাঁরা ভাবতেন, "এই নগণ্য লোকটি আবার আমাদের ডাক্তারজীকে উপদেশ দেয়?" কিন্তু ডাক্তারজী সকলের মহত্ত্বকে স্বীকার করে নিতেন। সকলের কথা শুনতেন। নম্রতা সহকারে উত্তর দিতেন। কখনো হেসে এড়িয়ে যেতেন। বাদবিবাদের মধ্যে যেতেনই না। পরে স্বয়ংসেবকদেরকে বুঝিয়ে বলতেন, "দেখো সংঘ কেবল আমার বা তোমার নয়, সংঘ হচ্ছে সম্পূর্ণ সমাজের। সুতরাং সমাজের যারা মাথা তাদের মত প্রকাশ করার পূর্ণ অধিকার আছে। মন দিয়ে তা আমাদের শুনতে হবে। আজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে চিন্তাতো করছে, কাল কাজও করতে পারে। আমাদের সাথে এলে আসতেও পারে।

"সেদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে সংঘের ভাবধারা খুবই সরল এবং প্রাচীন। নূতন কোন কথা আমি বলিনি। মহান্ তত্ত্বজ্ঞান যা আমাদের রয়েছে তাকে প্রত্যক্ষ ব্যবহারে আনার জন্যই আমাদের এই কাজ। সম্পূর্ণ সমাজকে একই পরিবারে রূপান্তরিত করাই আমাদের কাজ। সংঘ কাজের যা মূল বিচারধারা তা কঠিনও নয়—বা জটিলও নয়। কিন্তু বড় লোকেরা প্রত্যক্ষ ব্যবহারের কথা চিন্তা না করে শুধু ভাবের ঘরে ঘুরে বেড়াতে অভ্যস্ত। সেইজন্য সংঘকে তাঁরা বুঝতে পারেন না। কিছু লোক আবার

অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। রাশিয়া, জার্মানী, ইংল্যান্ড, আমেরিকা কোন না কোন দেশ ওঁদের খুবই প্রিয়। ভারতকে তাঁরা সেইমত তৈরী করতে চান এবং সে ধরনের চশমায় তাঁরা দেখে থাকেন।

"যারা নিজের দেশের ইতিহাস এবং তার মূলভুত তত্ত্বজ্ঞানের সাথে বর্তমান পরিস্থিতির সঠিক বিচার করবে তারা সংঘকে বুঝতে পারবে ও ভালও বাসবে।"

ডাক্তারজী যেখানেই যেতেন সেখানে যত তৎপরতার সাথে বড়বড় নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন ততোধিক তৎপরতার সাথে নূতন নূতন যুবক ও বালকদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। তাঁর বালকসুলভ মন সকল বালকদের খুবই আকর্ষিত করতো। মজা করে কখনো কখনো বলতেন—

জহাঁ বুঢ়োকা সংগ, ওঁহা শংকাওঁ সে তংগ
জহাঁ বালোঁকা সংগ, ওঁহা বাজে মৃদঙ্গ।
(বুড়োরা যেখানে সাথী শংকাও সেখানে অতি
যেখানে বালকদের সঙ্গ, সেখানে বাজে মৃদঙ্গ)।

— ❖ —

আকর্ষক ব্যক্তিত্ব

নাগপুরে শাখা বাড়তে থাকে। প্রথমে একটি, পরে দুই, আবার তার পরে বাড়তে বাড়তে দাঁড়ায় কুড়িতে। ডাক্তারজীর বাড়ীতে বালক ও তরুণ স্বয়ংসেবকেরা প্রতিদিন আসতে থাকত। পুরানো স্বয়ংসেবকেরা নূতন নূতন তরুণদের আনতো। ডাক্তারজী প্রত্যেকের সাথে পরিচয় করতেন এবং মনে রাখার চেষ্টা করতেন। আন্তরিকতার সাথে সকলের সাথে কথা বলতেন। প্রত্যেকেই যেন মনে করতো, ডাক্তারজী আমাকেই অধিক ভালবাসেন।

চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষিত করে তেমনি ডাক্তারজীও সহরের শতশত যুবককে আকর্ষিত করতে লাগলেন। দিনে একবার ডাক্তারজীর বাড়ীতে যাওয়া ও দশ-বিশ মিনিট সেখানে কাটানো যেন নিত্য অভ্যাসে পরিণত হলো। খবরের কাগজে ডাক্তারজীর না নাম ছাপতো, না কোন ছবি আসতো। তথাপি হাজার হাজার যুবক ডাক্তারজীকে চিনতো ও নিজেদের প্রিয় পথপ্রদর্শক বলে মনে করতো।

একদিন নাগপুরে জনৈক ধনী ও মানী ভদ্রলোকের বাড়ীতে বিয়ের উৎসব ছিল। উনি ডাক্তারজীর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। বিবাহ উপলক্ষে সেখানে একটি সুন্দর মণ্ডপ সাজান হয়েছিল। মণ্ডপে গদি বিছানো ছিল। মসনদ লাগানো ছিল। হাজার হাজার লোককে নিমন্ত্রিত করা হয়। লোকেরা আসছিলেন ও ঠিকঠিক স্থানে বসছিলেন। পরিচিত লোকেরা নিজ নিজ পরিচিত লোকের কাছেই স্থান গ্রহণ করছিলেন। বড় বড় লেখক বা কবি আসা মাত্রই তাদের স্তাবকেরাই তাদের ঘিরে বসতে লাগল। কেউ ছিলেন ধনী,

কেউ সরকারী কর্মচারী, কেউ ছিলেন নেতা আবার কেউ সাংবাদিক। তাঁদের পাশে ওঁদের বন্ধু-বান্ধবেরা বসে পড়েন। মহারাষ্ট্রের পদ্ধতি অনুসারে খয়ের, চুন, পান, সুপারী ও বিভিন্ন ধরনের বই সেখানে রাখা ছিল। লোকেরা পান খাচ্ছিলেন ও গল্প করছিলেন। সেই সময় ডাক্তারজীও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

পরিচিত লোকদের নমস্কার করে তিনি মণ্ডপের একটি স্থানে এসে বসলেন। যেমনই তিনি এসে বসলেন তখনই দেখা গেল এদিক ওদিকে যে সমস্ত যুবকেরা এতক্ষণ বসেছিল তারাও ডাক্তারজীর কাছে এসে বসে পড়লো। এতক্ষণ অন্যান্য নেতাদের কাছে তারা বসেছিল ও তাদের কথা শুনছিল। কিন্তু ডাক্তারজীর আকর্ষণ এত অধিক ছিল যে তারা সকলে ডাক্তারজীকে ঘিরে ধরলো। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে তারাদের অবস্থা যেমন হয় ঠিক তেমনই দেখা গেল উপস্থিত নেতাদের অবস্থা। যেন তারা ফিকে হয়ে পড়লো।

— ❖ —

প্রেরকশক্তি

যে সমস্ত ছেলেরা কারো কথা শুনতে চাইত না তারাই ডাক্তারজীর প্রত্যেকটি কথা শিরোধার্য বলে মনে করতে লাগল। যারা ছিল অলস তারাও ডাক্তারজীর কথায় কাজে নেমে পড়ল। যে ছিল কামচোর (অর্থাৎ যারা কাজে ভয় পেত) তারা ডাক্তারজীর কথায় কাজ শুরু করল। যারা ছিল শারীরিক দিক থেকে দুর্বল তারা সবলে পরিণত হল। সকল যুবকেরা ভাবতে লাগল দেশের কল্যাণের জন্য কিছু না কিছু করা দরকার। হিন্দু সংগঠন হচ্ছে একটা মহত্ত্বপূর্ণ কাজ এবং সেই কাজ ব্যক্তিগত সুখকে পরিত্যাগ করেও করা উচিত।

জনৈক ধনী ব্যক্তির পুত্র আইন পরীক্ষায় ভালভাবে উত্তীর্ণ হলে তার পিতা খুব খুশী হলেন। এই বুদ্ধিমান ছেলের জন্য ওর বাবা একটি ভাল চাকুরির ও সুন্দর পাত্রীর ব্যবস্থা করেন। একদিন তিনি নিজের ছেলেকে বলেন, "চল, এক জায়গায় আমার সাথে যেতে হবে। একজন বড় অধিকারীর সাথে দেখা করব।"

পুত্র—কি জন্য ওঁর সাথে দেখা করতে হবে?

বাবা—তাঁর সাথে আমার কথা হয়েছে। তিনি তোমাকে তাঁরই ডিপার্টমেন্টে একটা ভাল চাকরী দেবেন এরকম কথা দিয়েছেন।

পুত্র—চাকরীতো আমি করবো না।

বাবা—ওকালতির জন্যও ওনার সাথে সম্পর্ক রাখা একান্ত দরকার।

পুত্র—ওকালতিও আমি করবো না।

বাবা—তাহলে তুমি কি করবে? মেয়ের বাবা জানতে চান তুমি কি কর? তাহলে আমি তাঁকে কি বলব?

পুত্র—কারো সাথে দেখা করতে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন যে আমাকে আজীবন সংঘকার্য্য করতে হবে। আমি চাকুরী, ওকালতি বা কোন ব্যবসা করতে চাই না। বিয়েও আমি করবো না। মনে করুন আপনার চার ছেলের মধ্যে একজনকে দেশের কাজে ছেড়ে দিয়েছেন। আমাদের ডাক্তারজী আমাকে যেখানে পাঠাবেন সেখানে গিয়ে সংঘের কাজ করবো।

বাবা খুব রেগে গেলেন। মা কাঁদলেন। ছেলে কিন্তু রইলো অবিচল।

অনেক বাড়ীতেই এ ধরনের কথাবার্তা শোনা যেতে লাগল। উচ্চ শিক্ষিত বিভিন্ন ডিগ্রী বিভূষিত, ভাল ভাল ঘরের ভাল ভাল ছেলেরা সংঘ কাজের জন্য ডাক্তারজী যেখানে পাঠাতে লাগলেন সেখানে যাওয়া শুরু করে দিল। হাজার মাইল দূরে গিয়ে অপরিচিত নগর বা গ্রামে থাকতে লাগল ও সংঘের শাখা আরম্ভ করা শুরু করলো।

অনেক সময় বাবা মায়েরা ডাক্তারজীর কাছে এসে তাঁকে যা-তা বলতে লাগলেন কিন্তু ডাক্তারজী শান্তচিত্তে কথাগুলো শুনতেন ও পরে ধীর স্থিরভাবে মধুর কথার মাধ্যমে সংঘ কাজের ব্যাখ্যা করে যেতেন। কখনো কাউকে কোন ভাবে অপমান করেননি।

— ❖ —

আমাদের ডাক্তারজী

সংঘ কাজের জন্য ডাক্তারজী প্রায়ই ঘুরে বেড়াতেন। কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো সাইকেলে, কখনো রেলগাড়ীতে বিভিন্নভাবে তিনি হাজার হাজার মাইল ঘুরে বেড়াতেন, নূতন নতূন গ্রামে যাওয়া, ওখানকার যুবকদের একত্রিত করা, তাদের সংঘ বোঝান, যারা প্রৌঢ় ও বুদ্ধিমান তাদেরকে 'প্রতিজ্ঞা' দেওয়া, এইভাবে শাখা শুরু করা এটাই ছিল তাঁর নিত্য কাজ।

তিনি যখন পাঞ্জাবে পৌঁছালেন তখন সেখানকার স্বয়ংসেবকরা তাঁকে বিরাটভাবে অভ্যর্থনা জানালো। একজন স্বয়ংসেবক অন্যকে বলতে লাগলো, "চলো ভাই, আজ শাখায় চল। আজ বিশেষ কার্য্যক্রম আছে। আমাদের ডাক্তারজী এসেছেন।" লাহোর, লুধিয়ানা থেকে শতশত স্বয়ংসেবক ডাক্তারজীকে দেখতে এসেছে। ডাক্তারজী তাদের বলেন, "হাজার মাইল দূর থেকে আপনাদেরকে দেখার জন্য আমি এখানে এসেছি। সকলের সাথে দেখা করার খুবই ইচ্ছা ছিল। অন্যদিকে আপনারাও আমাকে দেখার জন্য ছিলেন লালায়িত। কারণ আমরা যে একে অপরের ভাই। একই মায়ের সন্তান আমরা। এটা মনে করানোর জন্যই সংঘ কাজ করছে। সারাদেশে বন্ধুত্বের পরিবেশ তৈরী করাই সংঘের কাজ। সংঘের কাজ খুবই সরল কিন্তু বাস্তবে রূপায়িত করা খুবই কঠিন। মহত্ত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, মনোযোগ সহকারে আমাদের কাজ করে যেতে হবে।"

পাঞ্জাবের স্বয়ংসেবকরা লম্বাচওড়া ভাষণ দেনেওয়ালা, গলাফাটিয়ে বলতে পারে,

নিজের ঢাক ঢোল পিটাতে পারে এমন নানা ধরনের নেতাদের দেখেছেন। কিন্তু ধীর স্থিরভাবে, মেপে-জোপে সাদাসিদে কথায় নিজের বক্তব্যের দ্বারা অপরের হৃদয়ে ছাপ ফেলতে পারেন এমন নেতা এই প্রথম দেখলেন। কথায় শুধু নয়, ব্যবহারের দিক থেকেও তিনি ঠিক তেমনই ছিলেন। তাই পাঞ্জাবেও সংঘের কাজ ভালভাবে চলতে লাগলো।

ডাক্তারজী বাংলায় এলেন। সেখানে কাজ একেবারেই নূতন। কিন্তু আত্মীয়তার অভাব লেশমাত্র ছিল না। ওখানকার স্বয়ংসেবকরা বলতে লাগলো "আজ সংঘ স্থানে ডাক্তারজী আসবেন।" ডাক্তারজী যখন তাদের সাথে বাংলায় কথা বললেন তখন সকলে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। কলকাতার অনেক খ্যাতনামা ও গণ্যমান্য লোকের সাথে তিনি দেখা করলেন। কেউ কেউ সংঘের সিধাসাদা কাজ দেখে অবাক হলেন এবং বললেন, "এটা কি ধরনের দেশের কাজ? না বোমা তৈরী করা, না পিস্তল চালনা, না ভাষণ, না দৈনিকপত্র চালানো, না ইংরেজদেরকে গালি দেওয়া। এটা কি কখনো দেশভক্তির কাজ হতে পারে?"

ডাক্তারজী ওদেরকে বুঝিয়ে বললেন, "দেখুন ভাই, স্বাধীনতা পাওয়া এমন কিছু কঠিন নয়। কিন্তু স্বরাজ্যকে সুরাজ্যে পরিণত করা বড়ই কঠিন ও মহত্ত্বপূর্ণ কাজ। যোগ্যতার মহত্ত্ব এই দুনিয়াতে খুব বেশী। যোগ্যতার অর্জনই উচ্চ স্থান প্রাপ্তিতে সহায়তা করে। তাহলে কারো কাছে হাত পাততে হবে না। এটাই দুনিয়ার নিয়ম। আমাদের মধ্যে যে দুর্গুণ আছে তার জন্য আজ আমরা অযোগ্য এবং অন্যের দাস হওয়ার কারণই তাই। সমস্ত দুর্গুণকে যদি ত্যাগ করতে পারি এবং সদ্‌গুণের সমাবেশ করতে পারি তবে হারানো বৈভব আমরা আবার ফিরে পেতে পারি। সব দিক থেকে আমাদের যোগ্য করে তুলতে হবে। এই সমস্ত শিক্ষা সংঘ দিয়ে থাকে। এই জন্য সংঘের শাখা চলে ও শাখাতে বিভিন্ন কার্য্যক্রম চলে। অন্য কোন ধ্যেয় সংঘের নেই। সংঘ বিশ্বাস করে যদি আমরা সদ্‌গুণী হয়ে সংগঠিত হতে পারি তবে সব সমস্যার সমাধান হবে ও স্বরাজ্য আমরা ফিরে পাবো। কঠিন কাজও হবে সহজলভ্য। সুতরাং অন্য সব কাজকে গৌণ মনে করে সংঘের কাজকে জীবনে সর্বপ্রথম স্থান দাও।"

একবার ডাক্তারজী পুনায় গেলেন। সেখানকার সংঘচালকের সাথে পায়ে হেঁটে কোথাও যাচ্ছিলেন। সামনের দিক থেকে দুটো বালককে আসতে দেখা যায়। ডাক্তারজীকে দেখে বাচ্চা দুটো সামান্য মুচকি হাসে। ডাক্তারজীও একটু হাসলেন। তখন সংঘচালক মহোদয় জিজ্ঞাসা করলেন, "এই বাচ্চারা কারা? কি করে এদের চিনলেন?" ডাক্তারজী বললেন, "এরা আমাদের সংঘের স্বয়ংসেবক।"

সংঘচালকজী জিজ্ঞাসা করলেন, "কি করে বুঝলেন এরা স্বয়ংসেবক? এরাতো গণবেশে ছিলনা, বা অন্য কোন চিহ্ন তো ওরা ধারণ করেনি।" ডাক্তারজী বললেন, "মনের চিহ্নই সবচেয়ে বড় চিহ্ন। মনকে সুসংস্কারিত করা ও মনকে যুক্ত করাই তো

সংঘের কাজ। কাজটা খুবই কঠিন, কিন্তু খুবই মহত্ত্বপূর্ণ। মনই তো প্রকৃত সাচ্চা মানুষ তৈরী করে।"

সব শাখার ছোট বড় সব স্বয়ংসেবকেরা ডাক্তারজীকে আপন বলে মনে করতো এবং ডাক্তারজীও তাদেরকে আপন বলে মনে করতেন।

— ❖ —

বন্ধুত্বের পরিবেশ

সংঘে আসার পর আমরা আমাদের মধ্যেকার বিভেদ ভুলে যাই এবং তা থেকে বন্ধুত্বের পরিবেশ গড়ে ওঠে। অনেকের কাছে এটা খুবই আশ্চর্য্য লাগে। কেউ কেউ ডাক্তারজীকে বলতেন—"এতে না আছে কোন যাদু, না আছে কোন রহস্য। এটাতো সহজ ও সরল কথা। যে লক্ষ্যে আমাদের পৌঁছাতে হবে তার দিকে ধ্যানপূর্বক নজর দিতে হবে। আমাদের মধ্যে যে সমস্ত দুর্গুণ আছে তা স্মরণ করো কিন্তু প্রকাশ কোরো না। অন্যেরা উল্টো ব্যবহার করে থাকে এবং ধ্যেয় কেবল বই ও বক্তৃতায় সীমাবদ্ধ থেকে যায়।"

১৯৩৪ এর ডিসেম্বর মাস। ওয়ার্ধাতে জমনালালজী বজাজ মহাশয়ের বাগানে সংঘ শিবির শুরু হয়েছে। নিকটস্থ বাংলোতে মহাত্মা গান্ধী বাস করতেন। শিবিরের ব্যবস্থা, সেখানকার অনুশাসন, স্বয়ংসেবকদের পরিশ্রমশীলতা, তাদের গণবেশ, নিজের পয়সায় আসা ও থাকা ইত্যাদি বিষয় গান্ধীজী যখন জানতে পারলেন তখন স্বয়ং উৎসাহ সহকারে সকাল ৬টার সময় শিবিরে উপস্থিত হন। সবদিক ঘুরে শিবিরের সব কিছু স্বচক্ষে দেখেন।

তাছাড়াও স্বয়ংসেবকদের ব্যায়াম, যোগব্যায়ামের কার্য্যক্রমও দেখেন। শতশত স্বয়ংসেবকদের উৎসাহপূর্ণ ও অনুশাসনবদ্ধ সম্মিলিত কার্য্যক্রম দেখে তিনি খুবই প্রভাবিত হন। স্বয়ংসেবকদের সাথে কিছু প্রশ্নোত্তর হয়েছিল ঃ

মহাত্মাজী—"এই গণবেশ কে তোমাকে দিয়েছে?"

স্বয়ংসেবক—"এটা আমার নিজের। আমি নিজেই এটা করিয়েছি।"

মহাত্মাজী—"তৈরী করার জন্য পয়সা কে দিয়েছে?"

স্বয়ংসেবক—"আমার মা বাবা দিয়েছেন। আমাদের এখানে আসার খরচ, খাবার খরচ—সব আমরা নিজেরাই দিয়েছি। দূরদূর গ্রাম থেকে আমরা আমাদের নিজেদের খরচে এখানে এসেছি। সংঘের নিয়মই এরকম।"

মহাত্মাজী—"যাওয়া আসার খরচ, গণবেশ, ভোজন শুল্ক সব খরচ বহন করে এখানে এসে লাভ কি? কি এমন এখানে আকর্ষণ আছে?"

স্বয়ংসেবক—"বিস্তারিত ভাবে সব কিছু বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু এক সাথে ওঠা, বসা, খেলা, ঘুমানো, ভোজন সবই আমরা আমাদের দেশের জন্য করি, এই ভাবনা অন্তরে জাগানোর মধ্যেই আনন্দ বিরাজ করছে।"

মহাত্মাজী—"তুমি কে? তোমার জাত কি?"

স্বয়ংসেবক—"আমি ছাত্র, আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ।"

মহাত্মাজী—"আর তুমি?"

স্বয়ংসেবক—"আমি রাজস্থানী বৈশ্য। আমার দোকান আছে।"

মহাত্মাজী—"তুমি কে?"

স্বয়ংসেবক—"আমি ক্ষেতমজুর। জাতিতে মাহার।"

তখন মহাত্মাজী এক এক করে সকলের পরিচয় জানতে চান। কেউ চামার, কেউ তেলী, কেউ ছিল মারাঠা ক্ষত্রিয়, আবার কেউ ছিল স্বর্ণকার। বিভিন্ন জাতির লোক ওখানে এসেছিল।

মহাত্মাজী—"এখানে তোমরা অস্পৃশ্যদের সাথে ওঠাবসা এমনকি খাওয়া দাওয়াও করছ?"

স্বয়ংসেবক—"সংঘে আমরা এধরনের ভাবনা পোষণ করি না। এমনকি জানার ইচ্ছেও হয় না। সকলে হিন্দু। এক ভারতমাতার সন্তান। একে অপরের ভাই। এই শিক্ষাই সংঘ আমাদের দিয়ে থাকে। সুতরাং উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ আমাদের অন্তঃকরণকে স্পর্শ করতে পারে না।"

মহাত্মাজী সংঘের সেই শিবির দেখে ও ডাক্তারজীর সাথে দেখা করে খুবই খুশী হন ও প্রভাবিত হন।

এইভাবে স্থানে স্থানে ছোট বড় কার্য্যক্রমের মাধ্যমে সংঘ সকলকে আকর্ষিত করেছে। সারা দেশে বন্ধুত্বের পরিবেশ সৃষ্টি করাই হল সংঘের প্রাথমিক কাজ।

— ❖ —

অবিরত পরিশ্রম

বহুবছর এক নাগাড়ে পরিশ্রম করার ফলে ডাক্তারজী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। চিকিৎসা ও বিশ্রামের জন্য তাঁকে নাসিকে নিয়ে যাওয়া হল। ডাক্তারজী হনুমানজীর একজন ভক্ত ছিলেন। তিনি বলতেন—"রামের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম কিসের?"

নাসিকে গেলেন বিশ্রাম নিতে কিন্তু সেখানেও শাখা খোলার চেষ্টা করতে লাগলেন। স্বয়ংসেবকেরা তাঁকে দেখতে আসতো এবং ঘন্টার পর ঘন্টা চলতো আলোচনা। তাঁর চিকিৎসক বললেন—"ডাক্তারজীর পূর্ণ বিশ্রামের দরকার। রাত দশটার মধ্যে যেন ঘুমিয়ে পড়েন।" কিন্তু ডাক্তারজীর বৈঠক রাত একটা বা দেড়টা পর্য্যন্ত চলতে থাকতো। বৈঠকের পরিবেশ এমনই থাকতো যে স্বয়ংসেবকেরা মন দিয়ে তা শুনে যেত। খাওয়া দাওয়া ভুলে যেত। চিকিৎসক মহোদয়কে সব বলা হলে তিনি বললেন, "আমি নিজেই আজকের বৈঠকে উপস্থিত থাকবো। ঠিক পৌনে দশটার সময় মনে করিয়ে দেবো এবং ঠিক দশটার সময় ঘুমোতে বাধ্য করবো।"

তদনুসারে রাত ৯টায় ডাক্তারজীর পাশে এসে বসে পড়লেন। ধীরে ধীরে তাঁর কথার রস উপভোগ করতে লাগলেন। একের পর এক বিষয় আসছিল। ডাক্তারজী সরল, সহজভাবে ও অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে বক্তব্য বলে যেতেন। প্রবলভাবে হাসি তামাসাও চলছিল। চিকিৎসক মহোদয় কিছু প্রশ্ন তোলেন। উত্তর শুনতে শুনতে এমনই মগ্ন হয়ে গেলেন যে ওখানে উপস্থিত হবার যে কারণ ছিল তাই তিনি গেলেন ভুলে। হঠাৎ ঘড়িতে চোখ পড়ায় তিনি দেখলেন, রাত দেড়টা বাজছে। বলে উঠলেন, "যাঃ একি হয়ে গেল? যা বলার জন্য এখানে আমার আসা সেটাই ভুলে গেলাম।"

ডাক্তারজীর কথাবার্তার মধ্যে থাকত মাধুর্য্য ও আকর্ষণের ক্ষমতা। প্রমুখ কারণ ছিল সেই আলোচনার মধ্যে কোন প্রকারের কৃত্রিমতার লেশ পর্য্যন্ত থাকতো না। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, তিনি যা কিছু বলতেন, প্রত্যেকটি শব্দের মধ্যে তাঁর তপস্যার ঝলক দেখতে পাওয়া যেত।

— ❖ —

কুশ পথক

প্রথম দিকে সংঘশাখায় কেবল যুবকেরা আসতো। ধীরে ধীরে ওদের সাথে ওদের ছোট ভাইয়েরাও আসা শুরু করলো। তখন কিশোর স্বয়ংসেবকদের একটি গণ তৈরী হল। ডাক্তারজী সেই গণের নামকরণ করলেন "কুশ পথক।"

প্রভু রামচন্দ্রের দুটি ছেলে ছিল। একটির নাম লব এবং অপরটির নাম কুশ। তারা তাদের মা, সীতাদেবীর সাথে গভীর অরণ্যে থাকতো। রাজপুত্র হওয়া সত্ত্বেও তারা ভাঙ্গা কুটিরে বসবাস করতো এবং শুকনো রুটি খেতো। বাল্মীকি মুনির কাছে লব কুশ পরিশ্রমপূর্বক পড়াশুনা করতো। রাজরাজেশ্বর প্রভু রামচন্দ্রের পত্নী হওয়া সত্ত্বেও সীতাদেবী বনে থাকতেন এবং অতি দুঃখে দিনাতিপাত করতেন। লবকুশ নিজের মা-এর দুঃখ দূর করবার জন্য খুবই সচেষ্ট ছিল। এই লক্ষ্যটা বালক স্বয়ংসেবকদের মনে ঢোকানোর জন্য সেই গণটার নাম দেন "কুশ পথক"। আমাদের অতীত ইতিহাস কত উজ্জ্বল কিন্তু আজ আমাদের ভারতমাতা পরাধীন। এই দুঃখী ভারতমাতার আমরা সকলে পুত্র।

পুত্রসম মনে করে, জীবনের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে তার দুঃখ দূর করে তাকে সুখী করা আমাদের কর্তব্য। কুশ পথকের স্বয়ংসেবকেরা এই লক্ষ্যকে সাদরে গ্রহণ করে ও আজীবন তা পালন করে। সেই সমস্ত ছোট ছোট কিশোরেরা যখন বড় হল তখন বিভিন্ন স্কুলে, কলেজে ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে কাজ করতে লাগলো। তাদের মধ্যে অনেকে সংঘকার্য প্রচারের জন্য অন্য প্রদেশেও যায়। ওদেরকে দেখে, অতি উচ্চ শিক্ষিত নবযুবকেরাও নিজ নিজ ঘরবাড়ী ছেড়ে, যেখানে পাঠান হল সেখানে গিয়ে শাখা শুরু করলো ও চালাতে লাগল। যারা যেখানে গেল, তারা সেখানকার হয়ে গেল। ওখানকার

ভাষা শিখে নিল। শিখে নিল স্থানীয় রীতি নীতি। সকলের বিশ্বাস অর্জন করলো। কাজের প্রসারের জন্য স্বয়ংসেবকেরা শিখলো তামিল, তেলেগু, মালয়ালম, গুজরাতী, বাংলা, পাঞ্জাবী,—তথা আরো অনেক ভাষা। এ সম্পূর্ণ দেশ আমার এবং আমি এ দেশের, এখানকার ভাষা আমার ভাষা। সব গ্রাম আমার গ্রাম এই ধারণা বিস্তার হতে লাগল।

ব্রাহ্মণ বা চণ্ডাল, গরীব বা বড়লোক, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত আমি যে কোন দল বা উপদলের বা যে কোন সম্প্রদায়ের হই না কেন, আমরা সব ভাই। একই মায়ের পুত্র—সংঘের এই ভাবনা, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সেইমত প্রত্যক্ষ জীবনেও তা প্রতিফলিত হতে দেখা গেল।

অতীতে যেমনভাবে ভগীরথ পাপনাশিনী গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনয়ন করেন, ঠিক তেমনি আধুনিক কালে ডাক্তারজী হীন কাজ ধ্বংস করার সংঘকার্য সারাদেশে চালু করেন।

বর্তমান সরসংঘচালক বালাসাহেব দেওরস সেই কুশ পথকের স্বয়ংসেবক ছিলেন এবং শিক্ষকও ছিলেন। এই পথক সংঘকে অনেক গণ্যমান্য কার্যকর্তা দিয়েছে।

— ❖ —

একই নেশা চেপেছিল

ডাক্তারজীর শরীর ছিল হৃষ্ট পুষ্ট। ছোটবেলায় তিনি খুবই ব্যায়াম করতেন। শারীরিক কষ্ট করার অভ্যাস ছিল। সংঘ আরম্ভ হবার পর তাঁর কষ্টের আর কোন সীমা ছিল না। সদাসর্বদা ভ্রমণ করতেন। পদব্রজে, সাইকেল, মোটর, রেলগাড়ী যা তিনি পেতেন তাতে করেই তিনি গ্রামে গ্রামে যেতেন। তাঁর কাছে না ছিল খাবার সময়, না ঘুমাবার। চরৈবেতি, চরৈবেতি চলতে থাক, সংঘের কাজ করে যাও। এই রকম পরিশ্রম চক্র মাসের পর মাস বছরের পর বছর চলতে লাগল।

পরিণামে তাঁর শরীর দুর্বল হতে লাগল। অসুখে পড়তে লাগলেন। পিঠে সদাসর্বদা বেদনা দেখা দিল। শীতকালেও শরীর থেকে এত ঘাম বার হত যার দরুন রোজ ২/৩ বার জামা পালটাতে হত।

কেউ একজন বললো, বিহারের রাজগীরে উষ্ণজলের একটা কুণ্ড আছে। সেখানে নিয়মিত কয়েকদিন স্নান করলে পিঠের ব্যথা দূর হয়ে যাবে। নাগপুরের কিছু প্রমুখ স্বয়ংসেবকও তাঁকে সেখানে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন। কয়েকজন ডাক্তারও সেই একই কথা বললেন। তখন ডাক্তারজী রাজগীর যাবার জন্য মনস্থ করলেন। ডাক্তারজীর সাথে আপ্পাজী যোশী ও আরো কয়েকজন কার্যকর্তাও রাজগীরে পৌঁছালেন।

রাজগীরে গিয়ে গরম জলে স্নান তো নিয়মমাফিক শুরু হল কিন্তু সাথে সাথে তাঁর প্রিয় কাজও শুরু হল। রাজগীরে দূর দূর হতে আগত লোকদের সাথে পরিচয় করে ও আত্মীয়তার মাধ্যমে তাদের সংঘকাজ বোঝাতে লাগলেন। রাজগীর নগরে গিয়ে

সেখানকার কিছু গণ্যমান্য লোকের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে সংঘের সিদ্ধান্ত বোঝান শুরু হল। অল্পদিনের মধ্যে সংঘ শাখা ওখানে চলতে লাগল। আবার আশেপাশের গ্রামেও যাতে সংঘশাখা শুরু করা যায় তার পরিকল্পনাও তৈরী হতে লাগল। সম্পূর্ণভাবে বিহারে কিভাবে সংঘের কাজ ছড়িয়ে দেওয়া যায় তার জন্য বিচার বিনিময় আরম্ভ হলো। ঘন্টার পর ঘন্টা বৈঠক চলতে লাগল।

ডাক্তারজীর সেবা করার জন্য যে সমস্ত স্বয়ংসেবক এসেছিল তাদের মধ্যে দ্বিধা। কি বলবে আর কি বা করবে? বলবে তো কাকেই বা বলবে? ডাক্তারজী চিকিৎসা করার জন্য এখানে এসেছেন, না সংঘ কাজের প্রচারের জন্য? সংঘ কাজ ছাড়া অন্য কোন কথায় তিনি মনই দিতেন না।

— ❖ —

এই চোখেই দেখতে চাই

"আমাদের কাজ শীঘ্রাতিশীঘ্র বাড়া দরকার। এই ১৯৪০ সালও কি ঠিক ঐ ভাবেই কাটবে?"

আপ্পাজী যোশী একটু বড় বড় চোখ করে ডাক্তারজীর দিকে দেখলেন। তিনি শুয়েছিলেন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বিড়বিড় করছিলেন। ঘুমের মধ্যেও সেই মহাপুরুষ কি করে সংঘ কাজ বাড়ান যায় তা চিন্তা করে যেতেন। জীবিত কালেই আমাকে আমার লক্ষ্যে পৌছতে হবে। এই চোখ দুটি দিয়ে সম্পূর্ণ ভারতকে সুসংগঠিত অবস্থায় আমি দেখতে চাই। এই ছিল তাঁর তীব্র ইচ্ছা। কিন্তু বারবারই অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। শরীর দুর্বল হয়ে পড়ছিল।

তাঁর বিশেষ গুণ ছিল যে তিনি নিজের মত অনেক কার্যকর্তা তৈরী করেছিলেন। ভাউরাও দেওরস এক ছাত্ররূপে লক্ষ্ণৌ পৌছালেন। ডাক্তারজীর প্রেরণায় তিনি সেখানে যান। তিনি লক্ষ্ণৌ, কানপুর ও উত্তরপ্রদেশের কিছু কিছু শহরে সংঘের শাখা শুরু করেন। সেই রকম রাজাভাউ পাতুরকরও পাঞ্জাবে যান। মালওয়া এবং মহাকোশলে একনাথ রাণাডে সংঘকাজ বিস্তার করেন। দিল্লীতে ও তার আশে পাশে বসন্তরাও ওক সংঘের কাজ করে চলছিলেন।

কোঙ্কন নামক ছোট্ট প্রদেশে মাধবরাওজী মুলে অনেক স্থানে সংঘের শাখা আরম্ভ করেন। দক্ষিণে দাদারাও পরমার্থ তাঁর চেষ্টার পরাকাষ্ঠা দেখান। বালাসাহেব দেওরসজীকে কলিকাতায় পাঠান হয়। নরহরী ও বাপুরাও দিবাকর বিহার প্রান্তে কাজ করেন। শান্ত, সৌম্য এবং দৃঢ় বাবাসাহেব আপ্টে সম্পূর্ণ দেশে ভ্রমণ করতে থাকেন। স্থানে স্থানে গিয়ে কার্যকর্তাদের সঠিক মার্গ দর্শন করেন ও নূতন প্রচারক তৈরী করেন।

এঁরা সব শিক্ষিত যুবক। কার্য্যতৎপর ও ধ্যেয়নিষ্ঠ ছিলেন। ডাক্তারজীর কথামত নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে এঁরা রাতদিন সংঘকাজ বাড়ানোর জন্য

রক্তকে জল করছিলেন। দেশের মুকুটমণি হিসাবে প্রতীত হবে এধরনের জনৈক কার্যকর্তাকেও ডাক্তারজী সংঘের দীক্ষা দেন।

তাঁর নাম ছিল মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর। এম. এস. সি. করার পর বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপক ছিলেন। তাছাড়া দুবছর তিনি নাগপুরে ওকালতি করেন। এরপরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের গুণে আকর্ষিত হয়ে ও স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন বই পড়ে সারগাছী আশ্রমের স্বামী অখণ্ডানন্দজীর নিকট গুরু মন্ত্র নেন। অখণ্ডানন্দজীর দেহত্যাগের পর তিনি যখন আবার নাগপুরে ফিরে এলেন তখন ডাক্তারজী তাঁকে বললেন দেশসেবা ঈশ্বরসেবার আর এক রূপ। সংঘের কাজ ঐশ্বরীয় কাজ।

ডাক্তারজীর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে গোলওয়ালকরজী (যিনি গুরুজী নামে অধিক পরিচিত) চব্বিশ ঘন্টা সংঘ কার্য্য শুরু করলেন। ডাক্তারজী তাঁকে অখিল ভারতীয় সরকার্য্যবাহ হিসেবে নিযোগ করেন। কৃষ্ণরাও মোহরীল, রামভাউ জামগড়ে, যাদবরাও যোশী, বাপুরাও ভিশিকর প্রভৃতি অনেক নবযুবক নিজেদেরকে ডাক্তারজীর হাতে তুলে দিলেন।

যেমনভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে, অবিবাহিত জীবন যাপন করে দেশের হিতার্থে আজীবন সংঘকাজ করতে পারে এমন কার্যকর্তা তৈরী করেছিলেন, ঠিক তেমনি নিজের ঘরবাড়ী, জমিজমা, ব্যবসা করেও বড় নিষ্ঠা সহকারে তন-মন-ধন দিয়ে লাগাতার সংঘ কাজ বৃদ্ধির জন্য কাজ করতে পারে এমন গৃহী কার্যকর্তাও ডাক্তারজী হাজারো সংখ্যায় সংগ্রহ করেছিলেন। উমরেড়ের ভাইয়াজী দানী, টিমনীর সরদার ভাউসাহাব ভুস্কুটে ও পুনার ব, না, তথা বাবারাও ভিড়ে এ্যাডভোকেট এদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

সেবা, ত্যাগ, সততা ও পরিশ্রমের এক নূতন ঢেউ সারা ভারতে সংঘ উৎপন্ন করলো। সংঘের প্রগতিতে সকলের চোখ টাটাতে লাগলো। অনেক শহরে বিজয়াদশমী উৎসবে হাজার স্বয়ংসেবকের পথ সঞ্চলন হতে লাগল। অনেকে বলতে লাগলেন, "আজ পর্য্যন্ত কেউ কখনো হিন্দুদের এত বড় সংগঠন তৈরী করেনি। আমরাতো ভাবতাম দুনিয়াতে হিন্দুরা জন্ম নিয়েছে কেবল নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করার জন্য। হিন্দু কখনো সংগঠিত হতে পারে না, কিন্তু ডাক্তারজীতো অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখালেন। ধন্য তিনি!"

লোকে সুনাম খুবই চায়। কিন্তু ডাক্তারজী তা মোটেই পছন্দ করতেন না। তিনি প্রায় বলতেন এতো সবে শুরু। যেখানে চারজন জড়ো হত না সেখানে জড়ো হচ্ছে চল্লিশ। এতেই সন্তুষ্ট হওয়া অনুচিত। আমাদের তো দেখতে হবে যে এখনো সমাজের বিরাট বড় অংশ অসংগঠিত। হাজার গ্রাম ঐ রকমই পড়ে আছে। শহরের হাজার হাজার স্থানে আমরা পৌঁছাতেই পারিনি। আবার নানাধরনের সমস্যা ঐ রকমই পড়ে আছে। এখন আমাদের দেশ পরাধীন, সমাজ দুর্বল ও আদর্শহীন।

"আমি কে? আর আমার কর্তব্য কি?" এর জ্ঞান হিন্দুসমাজের নেই। ওদের কাছে

আমাদের পৌঁছাতে হবে। সকলের হৃদয়ে দেশভক্তি, সামাজিক প্রেম জাগরণ করে হিন্দু রাষ্ট্রকে প্রকৃত বলশালী ও বৈভবশালীতে রূপান্তরিত করতে হবে।

রাতদিন তাঁর ঐ একই চিন্তা। কিন্তু হায় ঠাকুর, ওঁর শরীর অধিকাধিক দুর্বল হতে লাগল। রাজগীরে বেশ কিছুদিন থাকার পরও যখন কোন কিছু ফল হলো না তখন তিনি নিজের দেহের প্রতি নজর দেওয়া বন্ধ করলেন। আবার সংঘ কাজের জন্য ভ্রমণ শুরু করলেন। নূতন নূতন স্থানে যাওয়া, স্বয়ংসেবকদের সাথে দেখাশুনা করা, ওদেরকে সংঘ কাজের গুরুত্ব বোঝান। গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে দেখা করা, ওদেরকে প্রতিজ্ঞা দিয়ে স্বয়ংসেবক করা ইত্যাদি কাজ তিনি করে যেতে লাগলেন।

— ❖ —

সংঘ শিক্ষাবর্গ

আজকাল প্রত্যেক প্রান্তে প্রতি বছরে গরমের সময় সংঘ শিক্ষাবর্গ শুরু হয়ে থাকে। সেই সময় পুনা আর নাগপুরেই শুধু এধরনের বর্গ লাগতো। ১৯৪০ সালে পুনার সংঘ শিক্ষাবর্গ সমাপ্ত করে ডাক্তারজী নাগপুরে এলেন। আগে থেকেই ওঁর শরীর খারাপ ছিল। এবারে নাগপুরে আসার পর শরীর আরো খারাপ হয়ে পড়লো। রোজই খুব অধিক জ্বর হতে লাগল।

সংঘ শিক্ষা বর্গে তিন বছরের শিক্ষাক্রম। তৃতীয় বৎসরের শিক্ষা কেবল নাগপুরেই হয়ে থাকে। অতএব সারাদেশের স্বয়ংসেবকেরা সেখানে এসে থাকে।

বর্গে প্রতিটি স্বয়ংসেবকের সাথে ডাক্তারজী ব্যক্তিগত পরিচয় করতেন ও তার গুণসমূহের বিকাশের জন্য মার্গদর্শন করতেন। যদিও পুনা থেকেই ওঁর শরীর খুব খারাপ ছিল তথাপি নাগপুরের সব স্বয়ংসেবকের সাথে উনি দেখা করেন। জ্বরের জন্য নাগপুরের বর্গে ডাক্তারজী যেতে পারেননি। কার্যকর্তারা তাঁকে বারণ করেন। যে ডাক্তার ওঁর চিকিৎসা করছিলেন তিনিও বারণ করেন। ডাক্তারজী তারজন্য খুবই দুঃখ পান। বার বার তিনি বলতেন "আমাকে বর্গে নিয়ে চল। জ্বরের জন্য চিন্তা করবার কোন কারণ নাই।" জ্বর ছিল অধিক এবং খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। ঘরের বাইরে যাওয়া পর্য্যন্ত নিষেধ ছিল।

স্বয়ংসেবকদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারলে ডাক্তারজী খুবই আনন্দ পেতেন। স্বয়ংসেবক ওঁর কাছে ঈশ্বরের মত মনে হত। স্বয়ংসেবককে নবভারতের আধারস্তম্ভ বলে মনে করতেন। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নির্মাতা মনে করতেন। সেইজন্য প্রেম ও শ্রদ্ধার সাথে সেই স্বয়ংসেবকদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। হাসিঠাট্টাও ওদের সাথে করতেন। এটাই ছিল তাঁর দেশ সেবা, ভজনপূজন তথা সুখাস্বাদন।

পালা করে প্রমুখ স্বয়ংসেবকেরা ওঁর পাশে বসে ওঁর সেবা করতো। শিক্ষাবর্গের প্রতিদিনের বিবরণ ওঁকে জানাতে হত। তাহলেও দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটান যায়?

ডাক্তারজী স্বয়ংসেবকদের সাথে ওঠাবসা করতে চাইতেন ও সাক্ষাতে কথাবার্তা বলতে চাইতেন। স্বয়ংসেবকদেরকে স্বচক্ষে দেখতে চাইতেন। ডাক্তারজীর মানসিক বেদনা তাঁর চিকিৎসককে জানান হল। চিকিৎসকও ভাবলেন যে স্বয়ংসেবকদের সাথে দেখা করতে দিলে হয়তো উনি সুস্থ হলেও হতে পারেন। দেখা করার অনুমতি দেওয়া হল।

— ❖ —

অন্তিম ভাষণ

ভাল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে, সাবধানতার সাথে ৯ই জুন ১৯৪০ সালে ডাক্তারজীকে সংঘ শিক্ষাবর্গে নিয়ে আসা হল। সেই বছরে আগের বছর অপেক্ষা স্বয়ংসেবকদের সংখ্যা অনেক অধিক ছিল। আর একটা বিশেষত্ব ছিল যে এই বছরে প্রত্যেক প্রান্ত থেকে কেউ না কেউ উপস্থিত ছিল। বাংলা, বিহার, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, কর্ণাটক, গুজরাট, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি সব প্রান্তের স্বয়ংসেবক সেখানে উপস্থিত ছিল। বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ব্যবসা করে এমন স্বয়ংসেবক সেখানে উপস্থিত ছিল। ১৪ থেকে ৮৪ বছরের স্বয়ংসেবক সেই বর্গে অংশ নিয়েছিল। যেন সম্পূর্ণ ভারতের ছোট্ট একটি রূপ সেখানে উপস্থিত।

সর্বাধিকারীজীর সাথে ডাক্তার হেডগেওয়ারজী বৌদ্ধিক মণ্ডপে প্রবেশ করলেন। 'উত্তিষ্ঠ' বলার সাথে সাথে সব স্বয়ংসেবক দাঁড়িয়ে পড়লো। 'উপবিশ' আজ্ঞা পাবার সাথে সাথে সকলে আবার বসেও গেল। মঞ্চে রাখা গদীর চেয়ারে ডাক্তারজী বসে ছিলেন। নিষ্পলক দৃষ্টিতে সব স্বয়ংসেবক ডাক্তারজীর দিকে তাকিয়েছিল। একক গীত ও বোধপটের পর গম্ভীর ও শান্ত স্বরে ডাক্তারজী বলতে লাগলেন—

"মাননীয় সর্বাধিকারীজী, প্রান্তসংঘচালকজী, অন্যান্য অধিকারীবৃন্দ ও আমার প্রিয় স্বয়ংসেবক বন্ধুগণ।

"আমার ভয় হচ্ছে যে আমার শরীর ভাল না থাকার জন্য আমি যে দু-চারটা কথা আপনাদের সামনে বলবো তা ঠিকমত বলতে পারবো কি না। গত ২৪ দিন থেকে আমি একেবারে শয্যাশায়ী। বাস্তবিক সংঘ কাজের দিক থেকে এই বছরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই বছর এই বর্গে আমি যেন হিন্দুরাষ্ট্রের ছোট্ট একটি রূপ দেখতে পাচ্ছি।

"আপনারা সকলে কত দূর দূর থেকে এখানে এসেছেন আর আমি আমার অসুস্থতার জন্য আপনাদের সাথে দেখা করতে পারিনি। মনে খুব আশা ছিল। কিন্তু প্রত্যক্ষ পরিচয় করতে পারলাম না। পুনার সংঘ শিক্ষা বর্গে আমি ১৫ দিন ছিলাম। ওখানে আগত সব স্বয়ংসেবকদের সাথে ঠিকভাবে পরিচয় করতে পেরেছি। কিন্তু এখানে আমি আপনাদের কোনপ্রকার সেবা করতে পারিনি। ঠিক আছে! তা হতে

পারেনি। এখন তো সকলকে একত্রিত অবস্থায় পাওয়া গেছে তাই একটু সকলকে চোখ দিয়ে দেখি, পারলে ২/৪টা কথাও বলবো, এইজন্যই আজ আমি এখানে এসেছি।

"আপনাদের সাথে আমার এমন কোন পুরানো পরিচয় নেই। এখানে এমন অনেকে আছেন যাঁকে হয়ত আমি কখনো দেখিনি বা তিনি আমাকে দেখেননি। তা সত্ত্বেও আমার মন আপনাদের দিকে কেন ছুটছে? আপনাদের মনই বা কেন আমাকে টানছে? এর কারণ, এটা আমাদেরই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। সংঘের ভাবধারার এটা একটা বিশেষত্ব। যেই মাত্র সংঘের আদর্শ মেনে নিল সেখানে অপরিচিত থাকা সত্ত্বেও একে অপরকে আকর্ষিত করে ও ভালবাসতে শুরু করে। কিছুদিনের মধ্যে সেখানে গড়ে ওঠে গভীর বন্ধুত্ব।

"কিছুদিন আগেকার কথা। আমি তখন পুনাতে। সাথে ছিলেন সাংগলীর কাশীনাথ রাও লিমায়ে। দুজনেই পুনাতে অবস্থিত একটি কাঠের পুল পার হচ্ছিলাম। সেই সময় ৯/১০ বছরের দুটি বালক আসছিল। আমার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে ওরা চলে গেল। আমি কাশীনাথরাওকে বললাম, 'এই দুইজন বালক নিশ্চই স্বয়ংসেবক।' কাশীনাথ রাও বললেন, 'আপনি কি করে চিনলেন?' ওদের শরীরে তো বাহ্যিক কোন চিহ্ন ছিল না।'

"আমি বললাম 'দেখতে চানতো এখুনি দেখাচ্ছি।' ছেলেদুটোকে ডাকতেই ওরা আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। আমি ওদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমরা কি আমাদের চিনতে পারছ?' ছেলে দুটি বললো, 'হ্যাঁ চিনি, দুবছর আগে আপনারা আমাদের শাখায় এসেছিলেন। আপনি আমাদের সরসংঘচালক ডাক্তার হেডগেওয়ার এবং উনি সাংগলীর কাশীনাথ রাও লিমায়ে।' এভাবে একে অপরকে চিনতে পারা এবং আন্তরিকতা তৈরী হওয়া সংঘের তপস্যার ফল। এটা কোন ব্যক্তির কাজ নয়।

"এখনই আপনাদের সামনে মাদ্রাজের সঞ্জীব কামাথজীর ভাষণ হল। একজন অপরিচিত অতিথি হিসেবে এখানে এসেছিলেন। চারদিন এখানে কাটালেন ও বন্ধু হয়ে গেলেন। ভাই হয়ে তিনি এখান থেকে যাচ্ছেন। এই বন্ধনের শ্রেষ্ঠত্ব কিন্তু কোন ব্যক্তির নয়, শ্রেষ্ঠত্ব সংঘের।

"আমাদের ভাষা ভিন্ন, আচার ব্যবহার ভিন্ন। পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, বাংলা, দিল্লী, বোম্বে কত দূর দূর হতে আমরা এখানে এসেছি। তবুও সব স্বয়ংসেবক এভাবে মিলেমিশে কি করে আছে? কেন পরস্পর পরস্পরকে এত ভালবাসছে? কারণ একটাই এবং তা হচ্ছে আমরা সব রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের স্বয়ংসেবক। প্রত্যেকটি স্বয়ংসেবক একে অপরকে ভাই-এর চেয়েও অধিক ভালবাসে। মায়ের পেটের ভাই-এর সাথে কখনো কখনো টাকা পয়সা জমি জমা নিয়ে ঝগড়া বিবাদ হয়েও যায় কিন্তু স্বয়ংসেবকেরা কখনো নিজেদের মধ্যে কলহ করে না।

"গত ২৪ দিন আমি আমার ঘরেই ছিলাম। বিছানায় পড়েছিলাম। কিন্তু আমার মন আপনাদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মনের দিক থেকে আমি ছিলাম এখানে আর

শারীরিক দিক থেকে ছিলাম বাড়ীতে। গতকাল খুবই ইচ্ছা হয়েছিল যে এখানে এসে আপনাদের সাথে একত্রে প্রার্থনা করি কিন্তু চিকিৎসকেরা তার অনুমতি দেননি।

"আজ আপনারা সব নিজের নিজের জায়গায় ফিরে যাবেন। সুতরাং বিদায় জানাবার জন্যই আমার এখানে আসা। যদিও আপনারা দূরে চলে যাবেন ও আলাদা হয়ে যাবেন তবুও তাতে দুঃখের কিছু নেই। এখানে একত্রিত হয়ে আমরা একটি মহান্ লক্ষ্য ঠিক করে নিয়েছি এবং তার পূর্তির জন্য আমরা সব যাচ্ছি। প্রতিজ্ঞা করুন যে যতদিন শরীরে প্রাণ থাকবে ততদিন সংঘকে কখনো ভুলবো না। কোন কিছুর লোভে এ পথ কখনো ছাড়বো না। এমন কথা বলার সুযোগ যেন কখনো না আসে যে পাঁচ বছর আগে আমি সংঘের স্বয়ংসেবক ছিলাম। আমরা আজীবন স্বয়ংসেবক। তন-মন-ধন দিয়ে সংঘ কাজ করার ভাবনা আমাদের মনে যেন সব সময় জাগ্রত থাকে। আমি আজ সংঘের কতটুকু কাজ করলাম—এ প্রশ্ন রোজ ঘুমোতে যাবার সময় নিজেকে করা উচিত। আমাদের সব সময় মনে রাখা দরকার যে শাখার কার্য্যক্রম রোজ করলে অথবা রোজ শাখায় গেলেই সংঘের কাজ শেষ হল না। হিমাচল থেকে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত সমস্ত হিন্দুকে আমাদের সংগঠিত করতে হবে। সংঘের আসল কাজ তো শাখার বাহিরে। সংঘ কেবল স্বয়ংসেবকের জন্য নয়। সংঘের বাহিরে আর যারা আছে তাদেরকে সত্যিকারের পথ দেখানোই আমাদের একান্ত কর্তব্য। হিন্দু জাতির প্রকৃত কল্যাণ এই সংগঠনের মাধ্যমেই হবে।

"রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের আর অন্য কোন কাজ নাই। অনেকে জিজ্ঞাসা করেন ভবিষ্যতে সংঘ কি করবে? এ প্রশ্ন নিরর্থক। হিন্দু সমাজকে সুসংগঠিত করার কাজ আরো জোরের সাথে ভবিষ্যতেও করে যাবে। এই কাজ করা কালীনই আমরা শুভদিন দেখতে পাবো। এটা বাস্তব সত্য—আপনারা মনে রাখবেন। সেই দিন ভারত সংঘময় হয়ে যাবে। তখন হিন্দু সমাজের দিকে বাঁকা চোখে তাকানোর ক্ষমতা কারো হবে না। কাউকে আমরা আক্রমণ করতে চাইনা কিন্তু আমাদেরকে যেন কেউ আক্রমণ করতে না পারে তার দিকেও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে।

"এমন কিছু নূতন কথা আজ আপনাদের সামনে আমি বলতে চাই না। কেবল এটুকু বলতে চাই, আমরা সব স্বয়ংসেবক যেন সংঘকাজকে জীবনে প্রাধান্য দিয়ে চলি ও সংঘ কাজই যেন আমাদের জীবনের একমাত্র কাজ হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এখান থেকে সকলে নিজের নিজের স্থানে ফিরে যাবার সময় এই মন্ত্র যেন হৃদয়ে অঙ্কিত করে নেন। এই ধারণা নিয়ে আমি সকল বন্ধুদেরকে বিদায় দিচ্ছি।"

ডাক্তারজীর সেই ছোট্ট ভাষণটি ছিল খুবই প্রভাবশালী। সব স্বয়ংসেবক মন দিয়ে সেই ভাষণ শুনছিল। বলতে বলতে মাঝে দুই মিনিট ডাক্তারজী হঠাৎ নীরব হয়ে গেলেন। ক্লান্ত হতে ওঁকে খুব কমই দেখা যায়। ভাবে কখনো কখনো উনি গদগদ হয়ে পড়েন। কখনো কখনো উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিত্র ওঁর চোখের সামনে ভেসে উঠতো।

দুই মিনিট চোখ বন্ধ করে উনি চুপচাপ বসে রইলেন। সামনে যে সমস্ত স্বয়ংসেবক

বসেছিল তারাও চুপচাপ। অপলক দৃষ্টিতে ডাক্তারজীর দিকে তাকিয়ে ছিল। কেউই নড়াচড়া করছিল না। যে যেরকম বসেছিল ঐভাবে বসে আছে। যেন মনে হচ্ছিল সকলের দম বন্ধ হয়ে গেছে। অনেকের শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। অনেকের চোখে জল এল। কারো কারো মনে প্রবল ইচ্ছা সঞ্চারিত হয়ে উঠলো। ডাক্তারজীর সেই মৌনতাকে একটা গল্পই বলা চলে।

ভাষণ শেষ হল। মনে হল ডাক্তারজী যেন নিজের সব শক্তি স্বয়ংসেবকদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। এরপরই ডাক্তারজী খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত বর্গের কার্যালয়ে গিয়ে তিনি শুয়ে থাকেন। সামান্য সুস্থ বোধ করলে তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়।

বর্গ হল শেষ। স্বয়ংসেবকেরা ডাক্তারজীকে দেখার জন্য তাঁর বাড়ীতে গেলেন। কেবল দেখাই সার। তবুও ২/১টা কথা ডাক্তারজী বলেছিলেন। কখনো কাউকে প্রশ্ন করলেন "ভবিষ্যতে কি করবে?" কখনো জানতে চাইলেন "আবার কবে দেখা হবে?" কখনো কখনো বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন কার্যকর্তাদেরকে প্রণাম জানাবার কথা বলছিলেন। মন দিয়ে সংঘকার্য্য করার কথাও কখনো কখনো বলছিলেন।

এইভাবে স্নেহভরে সকলকে বিদায় দিচ্ছিলেন।

— ❖ —

সকলের দৃষ্টি একই দিকে

সংঘশিক্ষা বর্গ শেষ হয়ে গেল। এখন থেকে সংঘের কার্যকর্তারা ডাক্তারজীর সেবা সব সময় করে যেতে লাগলেন। ডাক্তারের কথামত সর্বরকমের পরিচর্যাও চলতে লাগল। যে সমস্ত বাহিরের স্বয়ংসেবকেরা ডাক্তারজীকে দেখতে আসতো তাদের মধ্যে অনেকে বলতো, "আপনি আমাদের ওখানে চলুন। ওখানকার হাওয়া বাতাস শরীরের দিক থেকে খুব লাভদায়ক হবে।" যাবার নেমন্তন্ন অনেক এল কিন্তু ডাক্তারজী কোথাও যেতে পারলেন না। কারণ বিধিবাম।

ডাক্তারজীর শরীর দিন প্রতিদিন খারাপ হতে লাগলো। নাগপুরের বড়বড় ও খ্যাতনামা ডাক্তারদের ডাকা হল এবং চিকিৎসা চলতে থাকল। কিন্তু রোগ একটুও কম হলো না। ২০শে জুন ১৯৪০ সালে মেয়ো হাসপাতালে ওঁকে ভর্তি করা হল। নানা প্রকারের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হল। কিন্তু রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হলো না। পিঠে দারুণ ব্যথা ছিল। সাথে ছিল ভীষণ জ্বর। খুবই দুর্বল অনুভব করতে লাগলেন। ব্যথা যেন বাড়তির দিকে। হাসপাতালের আবহাওয়া ওঁর একেবারেই ভাল লাগছিল না। অতঃপর নাগপুরের সংঘচালক শ্রী বাবাসাহেব ঘটাটের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হল।

সব চেয়ে ভালো ডাক্তার ও ভালো ভালো ঔষধের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। সকলেই খুব চেষ্টা করে চলেছিলেন। কার্যকর্তারাও সেবা পরিচর্য্যা এক নাগাড়ে করে

চলেছিলেন। "হে ভগবান! আমাদের ডাক্তারজীর রোগ সারিয়ে দিন"। এ ধরনের প্রার্থনা হাজার হাজার স্বয়ংসেবক নিজ নিজ বাড়ীতেও করে চলেছিল। কিন্তু অবস্থা দিনপ্রতিদিন খারাপের দিকেই যাচ্ছিল।

ডাক্তারজীর কখনো কখনো মনে হতে লাগল যে আর অল্পদিনই তিনি ইহলোকে আছেন। যাদবরাও যোশী সব সময় তাঁর পাশেই থাকতেন। উনি একজন ভাবুক যুবক এবং ডাক্তারজীকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। একদিন ডাক্তারজী তাকে বলেন "শোন যাদব, যদি কোন সংঘের বড় অধিকারীর মৃত্যু ঘটে তবে অন্তিম যাত্রা কিভাবে সম্পন্ন করবে?"

একথা শুনে যাদবরাও ক্ষণিকের জন্য চুপ হয়ে গেলেন। চুপচাপ চোখের জল মুছলেন। সেই প্রশ্নকে এড়িয়ে গিয়ে যাদবরাও বললেন, "আমার মনেই নেই যে ঔষধ আনার সময় হয়ে গেছে।"

যাদবরাও উঠে পড়লেন। ডাক্তারজীকে ঔষধ খাওয়ালেন। ডাক্তারজী নীরবে ঔষধ খেয়ে নিলেন। যাদবরাও মনে মনে খুশী হলেন। মনে করলেন ডাক্তারজীর হয়ত অশুভচিন্তার কথা ভুলে গেছেন।

কিন্তু একটু পরেই ডাক্তারজী অত্যন্ত শান্ত ও গম্ভীর স্বরে বললেন, "আমাদের সংঘে পারিবারিক জীবনের মহত্ত্ব যথেষ্ট। নেই কোন আড়ম্বর বা লোক দেখানো। কোন সংঘের অধিকারী মারা গেলে তাঁর শেষ যাত্রা যেন সাদাসিধা হয়। সৈনিক সঞ্চলন, রাজকীয় আড়ম্বর যেন না থাকে।

একদিন দুপুরে যাদবরাও যখন ডাক্তারজীকে চা দিতে যান তখন ডাক্তারজী বলেন, "সকলকে ডেকে নিয়ে এস, সকলের সাথে চা খাব।"

যাদবরাও অনেক করে বুঝালেন কিন্তু ডাক্তারজী একজন বাচ্চার মত জেদ ধরে থাকলেন। চা খেতে অস্বীকার করলেন ও মুখ ঘুরিয়ে থাকলেন। চুপচাপ পড়ে থাকলেন। যাদবরাও ঘাবড়িয়ে গেলেন। কি করবেন তা বুঝে উঠতে পারলেন না।

এমন সময় শ্রী গুরুজী ওখানে এসে পৌঁছুলেন। সব জানতে পেরে চারিদিকে তাড়াতাড়ি স্বয়ংসেবকদেরকে পাঠিয়ে সব কার্যকর্তাদেরকে একত্রিত করলেন। পনের-বিশ পেয়ালা চা-আনা হল। ডাক্তারজীকে উঠিয়ে বসান হল। তখন ডাক্তারজী সকলের সাথে খুব আনন্দ সহকারে চা খেলেন।

নিজের জীবন সমাপ্ত হতে চলেছে বুঝে যীশুখ্রীষ্টও নিজের শিষ্যদেরকে খুব আদরের সাথে ভোজন করিয়েছিলেন। পরলোক যাবার প্রাক্কালে স্বামী বিবেকানন্দও নিজের গুরুভাই ও শিষ্যদের সাথে একত্রে ভোজন করেন।

— ❖ —

আমি বাংলায় আসছি

১৯শে জুন ১৯৪০ সালের কথা। সন্ধ্যার সময় জনৈক বাঙ্গালী ভদ্রলোক ডাক্তারজীর সাথে দেখা করতে আসেন। তিনি একজন পুরাতন বিপ্লবী। এক সময় তিনি ডাক্তারজীর

একজন বন্ধু তথা সহকারী ছিলেন। একে অপরকে দেখামাত্র উভয়ে প্রসন্ন হলেন। উভয়ে খুশীতে যেন ডগমগ। উভয়ে উভয়কে জড়িয়ে ধরলেন। পরে ডাক্তারজী তাঁকে নিজের পাশে বসালেন। কুশল বিনিময় হল। পুরানো স্মৃতি আবার সামনে এল। আবার ডাক্তারজী তাঁকে বললেন, "ঠিক আছে অসুখ থেকে ভাল হয়ে ওঠামাত্রই আমি বাংলায় যাবো এবং সব পুরানো বন্ধুদের সাথে দেখা করবো। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংঘের কত আবশ্যকতা আমি ওঁদের বোঝাবো। সকলে একাজের দায়িত্ব নিজ ঘাড়ে নিতে যদি সম্মত হয় তখনই এই দেশের পরিস্থিতিতে পরিবর্তন আসবে ও এই দেশের পুরো চেহারা পাল্টিয়ে যাবে।"

এধরনের নানা কথা হতে লাগল। অবশেষে সেই ভদ্রলোক ডাক্তারজীকে বললেন, "আগামীকাল নাগপুরে দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বোস আসছেন। আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে তিনি খুবই আগ্রহী। এই খবরটা দেবার জন্য আমি এখানে এসেছি।"

পরের দিন সুভাষচন্দ্র বোস শ্রীবাবাসাহেব ঘটাটেজীর বাড়ীতে এলেন। কিন্তু তিনি ডাক্তারজীর সাথে দেখা করতে পারলেন না। সেই সময় ডাক্তারজীর গায়ে খুবই জ্বর। চোখ ছিল বন্ধ। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা। সুভাষবাবু ডাক্তারজীর অবস্থা বুঝতে পারলেন। যখন স্বয়ংসেবকেরা ডাক্তারজীকে জাগাতে যাচ্ছিল তখন সুভাষবাবু বারণ করলেন এবং বললেন, "না না, এখন ওঁকে জাগানো ঠিক হবে না। আমি আবার আসবো।" কিছুক্ষণ তিনি ওখানে চুপ করে বসে দেখতে থাকলেন। পরে ডাক্তারজীকে নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

— ❖ —

উত্তরাধিকারী

ডাক্তারজীর রক্তচাপ বাড়তে লাগল। অবশেষে চিকিৎসকেরা লাম্বার পাংচার করে জল বার করা ঠিক করলেন। ডাক্তারজী যখন এটা জানতে পারলেন তখন তিনি শ্রীগুরুজী, মাননীয় বাবাজী পাধ্যে, বালাসাহেব দেওরস, কৃষ্ণরাও মোহরীল ইত্যাদি অন্যান্য কার্যকর্তাকে নিজের ঘরে ডাকলেন।

ঘরের পরিবেশ সেই সময় ছিল অত্যন্ত চিন্তাপূর্ণ। সকলে নিষ্পলক দৃষ্টিতে ডাক্তারজীর দিকে তাকিয়ে আছেন। মাঝে মাঝে যে কল্পনাগুলি সামনে আসছে সেগুলোকে চাপবার চেষ্টা করছেন। শ্রীগুরুজীকে বললেন, "এখন লাম্বার পাংচার হোক। এটাই শেষ চেষ্টা। যদি আমি ভাল হয়ে উঠি তবে তো কথাই নেই, অন্যথা সংঘকাজের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আপনার উপর থাকল এটা আপনি মনে রাখবেন।"

গুরুজী তাঁকে বললেন, "ডাক্তারজী, এটা আপনি কি বলছেন? বিশ্বাস করুন, শীঘ্রই আপনি ভাল হয়ে উঠবেন।"

এতে ডাক্তারজী একটু হাসলেন এবং বললেন, "আশা করাই মানুষের উচিত। এটা আমি জানি। কিন্তু সাথে সাথে কঠিন থেকে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা আমাদের করা উচিত। যে কথাটা আমি বললাম সেই রকম কাজ করে যান।"

ডাক্তারজী নিশ্চিন্ত হলেন। তিনি চিকিৎসকদের বললেন, "এখন আপনারা যখন চান তখনই লাম্বার-পাংচার করতে পারেন।"

চিকিৎসকেরা আলাপ আলোচনা করে ঠিক করলেন যে সন্ধ্যের সময় লাম্বার পাংচার করা হবে। সেদিন ব্যথায় তিনি খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন। শারীরিক কষ্টতো পাচ্ছিলেনই আবার মনও ছিল সন্ত্রস্ত। নিজের জীবনে সম্পূর্ণ দেশ সুসংগঠিত হয়েছে, স্বতন্ত্র ও সমৃদ্ধ হয়েছে এটা দেখে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শরীরতো আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে। আমার প্রিয় স্বয়ংসেবক বন্ধুগণ, আমার প্রেমের স্থান ও আরাধ্য। ওদেরকে সংঘের কাজ বাড়ানোর জন্য কতই না ঝামেলা পোয়াতে হবে।

এই সব চিন্তায় মগ্ন তিনি ছিলেন। জলের বাইরে মাছ থাকলে, মাছের যেমন অবস্থা হয়, ওঁর মনের অবস্থা ঠিক সেইরকম। ঘুম একেবারেই আসছিল না। এপাশ ওপাশ করছিলেন। কখনো উঠছিলেন, কখনো বসছিলেন, আবার কখনো গভীর চিন্তা করছিলেন। যেইমাত্র শ্রীগুরুজীকে এই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করলেন তখনই উনি হলেন শান্ত।

সন্ধ্যের সময় লাম্বার পাংচার করা হল। সাধারণতঃ লাম্বার পাংচার করলে দেখা যায় মেরুদণ্ড থেকে টপ টপ করে জল পড়ে, কিন্তু এখানে দেখা গেল যে জলধারা যেন বয়ে যাচ্ছে। অনেক জল বার হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু রক্ত চাপ কম হল না। একটুও আরাম তিনি পেলেন না।

মাঝ রাতের পরই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। সকালে জ্বরের মাত্রা দেখা গেল ১০৬ ডিগ্রী। নাগপুরের সব বড় বড় ডাক্তার ডাক্তারজীকে দেখতে এলেন। নানা সলা-পরামর্শ হল। নানা প্রকার উপায় করে দেখা হল। শেষে সকলে নিরাশ হয়ে পড়লেন।

ডাক্তারজীর অবস্থা যে খুব খারাপ এ সংবাদ নাগপুরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। হাজার হাজার স্বয়ংসেবক ঘটাটেজীর বাড়ীতে জমায়েত হতে লাগলো। বারবার জানতে চাইল। নিজেদের বুদ্ধি অনুসারে দৌড়ধূপ করতে লাগল। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করল। কিন্তু মৃত্যুর সামনে সবাই অসহায়।

২১শে জুন ১৯৪০ সকাল ৯টা ২৭ মিনিট। ডাক্তারজী মারা গেলেন। হাজার হাজার স্বয়ংসেবকের জীবনের আদর্শ যেন কোথায় চলে গেল! রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের নির্মাতা, কুশল কার্যকর্তা পরম পূজনীয় আদ্যসরসংঘচালক ডাক্তার হেডগেওয়ারজী চলে গেলেন।

— ❖ —

মহাপ্রয়াণ

শ্রীমাধব রাও ঘটাটেজীর বাড়িতে হাজার হাজার স্বয়ংসেবক অধোবদনে নীরবে বসে আছে। নিজেদের প্রিয়তম নেতাকে শেষ বার দেখার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আছে।

অনেকের চোখে জল। আবার অনেকে কাঁদছে। অনেকে বার বার ভিতরে যাচ্ছে আর অপলক নেত্রে ডাক্তারজীর দিকে তাকিয়ে আছে। অনেকে আবার নীরবে নানা কাজে ব্যস্ত। ধীরে ধীরে ডাক্তারজীর মৃত্যুর খবর নাগপুরে ছড়িয়ে গেল। হাজারে হাজারে জনতা সেখানে আসতে লাগল। টেলিগ্রাম ও টেলিফোনের দ্বারা দূরবর্তী গ্রাম ও নগরে খবর পাঠান হল। বাহির থেকে স্বয়ংসেবকেরা সাইকেলে, মোটরে, রেলে যে যেভাবে পারল ডাক্তারজীর অন্তিম দর্শনের জন্য আসতে লাগল।

২১শে জুন ১৯৪০ সাল। সময় বৈকাল ৫টা। শবযাত্রা শুরু হল। হাজার হাজার স্বয়ংসেবক ও নাগরিক তাতে অংশ নিল। এত লম্বা শবযাত্রা কেউ কখনো দেখেনি। লোকেরা শান্ত ছিল। না ছিল শ্লোগান, না ছিল কোন চীৎকার। সব কিছু ছিল সাধারণ কিন্তু অনুশাসনবদ্ধ।

মোড়ে মোড়ে বিভিন্ন জাতি, দল ও বিভিন্ন স্তরের লোকেরা ডাক্তারজীকে সম্মান দেখানোর জন্য দণ্ডায়মান ছিল। কেউ ডাক্তারজীর শবে মালা দিলো আবার কেউ ছড়ালো ফুল। রাত ৯টায় এই শবযাত্রা রেশমবাগে পৌঁছালো। ডাক্তারজীর দাহ কাজ শ্মশানে না করে এই রেশমবাগেই করা হয়।

রেশমবাগ ছিল তাঁর কর্মভূমি। পয়সা জোগাড় করে এই রেশমবাগ মাঠটি তিনি সংঘের জন্য কিনেছিলেন। সেই মাঠেই কত না সংঘ শিক্ষাবর্গ ও আরো অনেক ছোট বড় উৎসব হয়েছে। ঐ মাঠের প্রতিটি কণা ডাক্তারজীর পাদস্পর্শে পবিত্র। ওখানকার বায়ুমণ্ডলে ডাক্তারজীর কথা যেন ভেসে বেড়াচ্ছে। সেই রেশমবাগে ডাক্তারজীর দেহ হল ভস্মীভূত। সকলে দুঃখের সাগরে ডুবে গেল।

— ❖ —

ডাক্তার হেডগেওয়ার অমর রহে

ডাক্তারজীর সম্পূর্ণ জীবন ছিল ত্যাগময় এবং কষ্টময়। তাঁর আত্মা ছিল তেজোময়। ছোটবেলা থেকে তিনি দেশভক্তির ব্রত গ্রহণ করেন এবং তা তিনি দৃঢ়তা ও আন্তরিকতার সাথে সম্পন্ন করেন। ডাক্তারজীর চরিত্র ছিল নির্মল।

তাঁর দেহ ছিল সুদৃঢ় ও শ্যামবর্ণ। মুখে ছিল বসন্তের দাগ। তাঁর চোখে ছিল অলৌকিক তেজ, মুখে ছিল বিরাট গোঁফ। এসত্ত্বেও তাঁকে দেখাত শান্ত, সৌম্য ও প্রেমময়।

সদাসর্বদা তিনি প্রসন্ন থাকতেন। রাতদিন পরিশ্রম করতেন। সংঘ কাজের চিন্তায় তিনি বিভোর হয়ে থাকতেন। পয়সার অভাব লেগেই থাকত। ছোট ছোট সমস্যা প্রায়ই দেখা দিত। এতৎসত্ত্বেও তিনি সদাসর্বদা প্রসন্ন থাকতেন। সেই প্রসন্নতাকে তিনি অতি সহজ ভাবেই চারিদিকে বিতরিত করতেন। ভাষণ ও সম্ভাষণের পদ্ধতি ছিল অতীব সাধারণ। অহংকার তাঁকে কখনই স্পর্শ করে নি। ক্রোধকে তিনি জয় করেছিলেন। লোভ

ও মোহকে তিনি ছোটবেলা থেকেই ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর পরিধান ও চলাফেরা ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে।

আমরা বলে থাকি ডাক্তারজীর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদি আমরা দেখি ও বিচার করি তাহলে দেখতে পাব ডাক্তারজী আজও জীবিত আছেন। কারণ ডাক্তার হেডগেওয়ার ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ একই জিনিষ। যখন সংঘ বিদ্যমান তখন ডাক্তারজীর মৃত্যু কি করে হতে পারে? তিনি প্রতিটি সংঘস্থানে বিদ্যমান। প্রতিটি স্বয়ংসেবকের মধ্যে তিনি বিরাজমান।

যদি আমরা নিয়মিত ভাবে শাখায় যাই, সেখানকার কার্যক্রমে আন্তরিকতার সঙ্গে অংশ নিই, যদি সংঘকার্য তন, মন ও ধন দিয়ে সততার সাথে ও আন্তরিকতার সাথে করি তবে আমাদের ভিতরেই আমরা ডাক্তারজীকে দেখতে পাব।

— ❖ —

পূজনীয় ডাক্তারজীর জীবনপঞ্জী

১৮৮৯—১লা এপ্রিল নাগপুরে শুভজন্ম।

১৮৯৭—রাণী ভিক্টোরিয়ার ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে দেওয়া মিষ্টি ফেলে দেন ছোট্ট কেশব।

১৯০৩—একই দিনে মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে পিতামাতার মৃত্যু।

১৯০৮—'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দেওয়ার জন্য স্কুল থেকে বহিষ্কার।

১৯০৯—'ন্যাশনাল ইউনিভারসিটি অফ ক্যালকাটার' অমরাবতী স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ।

১৯১০—কলকাতাতে দাঙ্গার সময় শুশ্রূষাদল তৈরী।

১৯১৩—কলকাতাতে 'বন্যা সহয়তা সমিতি' তৈরী করেন।

১৯১৪—কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ থেকে মেডিক্যাল পাশ করেন। তদানীন্তন বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ।

১৯১৬—নাগপুরে ফিরে এসে নানান সামাজিক কাজে যোগদান।

১৯১৭—সারাজীবন অবিবাহিত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে কাকাকে লিখেছিলেন, দেশ-মাতৃকার চরণে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করতে চাই। তাতে জীবনে যাই ঘটুক না কেন? একজন নারীর জন্য আমি আমার সম্পূর্ণ জীবন দিতে প্রস্তুত নই।

১৯২০—'ভারত সেবক মণ্ডলের' প্রধান সম্পাদক। নাগপুরে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সেশনের সময় ঋষি অরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

১৯২১—অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান। রাষ্ট্রদ্রোহী ভাষণ (প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রহিতকর) এবং আদালত অবমাননার জন্য এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

১৯২২—কারামুক্তি। রাজনৈতিক অবস্থার পূর্ণ অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ।

১৯২৩—মসজিদের সামনে দিয়ে বাদ্য বাজিয়ে শোভাযাত্রার যে নিষেধাজ্ঞা তার অস্বীকার। কারণ হিন্দুরা ভারতে যে কোন বৈধ আনন্দ উপভোগের অধিকারী।

১৯২৫—বিজয়াদশমীর পুণ্যদিনে মহান্ হিন্দু সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্থাপনা।

১৯২৬—সংঘে প্রথম শারীরিক ও মিলিটারী ট্রেনিং-এর আয়োজন। ওয়ার্ধা শহরে শাখা শুরু। সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে নেতৃত্ব নেওয়ার জন্য অনুরোধ।

১৯২৮—সংঘে প্রথম 'গুরুদক্ষিণা'র প্রচলন।

১৯৩০—জঙ্গল সত্যাগ্রহের জন্য কারাবাস।

১৯৩১—হিন্দুধর্ম থেকে চলে যাওয়া ভাইদের পুনরায় নিজধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য 'শুদ্ধিযজ্ঞ'।

১৯৩২—শ্রীগুরুজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। বোম্বাইতে সংঘের কাজের বিস্তার।

১৯৩৩—নাগপুরে রেশমবাগ সংঘস্থান ক্রয় করা হয়। যাকে তপোভূমি নামে অভিহিত করা হয়।

১৯৩৪—মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে ওয়ার্ধা শিবির পরিদর্শন।

১৯৩৬—ভোঁশলে মিলিটারী স্কুল স্থাপনের ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ।

১৯৩৭—পুনাতে বিখ্যাত সোন্যা-মারুতী সত্যাগ্রহ।

১৯৩৮—পুনাতে হিন্দু যুবক পরিষদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব। পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে সংঘের কাজ শুরু। এরপরই স্বাস্থ্যের ক্রমশঃ অবনতি।

মাদ্রাজ ও গুজরাটে সংঘের কাজ শুরু হয়। ১৩ই আগষ্ট পরমপূজনীয় শ্রীগুরুজীর উপর সরকার্যবাহের দায়িত্ব। বাংলাতে সংঘের কাজ শুরু।

১৯৪০—চিকিৎসার জন্য রাজগীরে। সংঘের আজ্ঞা ও প্রার্থনা সংস্কৃত ভাষাতে শুরু।

২৯ এপ্রিল—পুনা ও, টি, সি।

১৫ই মে—পুনা থেকে নাগপুর প্রস্থান।

১৬ই মে—ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সঙ্গে সাক্ষাৎ।

৮ই জুন—নাগপুর ও, টি, সি,-তে স্বয়ংসেবকদের উদ্দেশে অন্তিম ভাষণ।

১৫ই জুন—নাগপুরে মেয়ো হাসপাতালে ভর্তি।

১৮ই জুন—ঘটাটেজীর বাংলোতে নিয়ে আসা।

২০শে জুন—ভারতমাতার কৃতী সন্তান নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস তাঁকে দেখতে আসেন। ডাক্তারজী অচেতন অবস্থায় থাকায় কোন কথাবার্তা সম্ভব হয়নি। সন্ধ্যার কিছু পরে অবস্থা আরও সংকটের দিকে যেতে থাকে। প্রমুখ কর্মকর্তাদের সামনে শ্রীগুরুজীর উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন, "আমার অবস্থা যদি ঠিক হয়ে যায় তাহলে কোন প্রশ্ন নেই। অন্যথা সংঘের দায়িত্ব আপনার কাঁধেই থাকবে।"

২১শে জুন—সকাল ৯টা ২৭মি পরমপূজনীয় ডাক্তারজী চিরশান্তির জন্য শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। বিকাল ৫টায় নাগপুরে ডাক্তারজীর শবদেহ নিয়ে শোকযাত্রা, যাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধার্মিক নেতৃবৃন্দ যোগ দিয়েছিলেন।

রাত ৯টায় তাঁরই প্রিয় ভূমি সেই রেশমবাগে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

— ❖ —

ডাক্তারজীর স্মৃতি-মন্দির ও শ্রীগুরুজীর স্মৃতি-চিহ্ন

রেশমবাগ, নাগপুর